~ www.amarboi.com ~

মামলার সাক্ষী ময়না পাখি

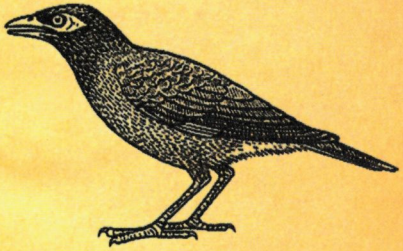

শাহাদুজ্জামান

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
শাহাদুজ্জামান এই বইয়ে এক স্তন্যপায়ী প্রাণীর কথা শুনিয়েছেন, যিনি গল্প লেখেন, শুনিয়েছেন এমন একজনের কথা, যাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবস্থান খুব পরিষ্কার, কিংবা যাঁর হাতে টুকরো রোদের মতো খাম, জানিয়েছেন এক চিন্তাশীল প্রবীণ বানর, এক বোধিপ্রাপ্ত উবারচালক, অপস্রিয়মাণ তিরের দিকে তাকিয়ে থাকা এক যুগল আর ওয়ানওয়ে টিকিট হাতে এক বেকুবের কথা, সেই সঙ্গে শুনিয়েছেন এক বৃহস্পতিবারের গল্প, হরিণের মতো এক নারীর গল্প, যে লবঙ্গের বঙ্গ ফেলে দেয়, এক ময়না পাখির গল্প, যে মামলার সাক্ষী দেয়, সবশেষে মুখোমুখি করেছেন দুই নাজুক মানুষকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
# মামলার সাক্ষী ময়না পাখি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মিথিলা ফারজানা
জ্যোতি জয়েনউদ্‌দীন

দেখে ভালো লাগে তুমুল ব্যস্ত মেট্রোপলিটান হিজিবিজি জীবনেও
সাহিত্য তোমাদের টানে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লেখকের কথা

এই গল্পগুলো ২০১৫ থেকে ২০১৮ সালের ভেতর লেখা। এগারোটা গল্পের চারটি ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, বাকি সাতটি গল্প এই বইয়ে প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে। 'জনৈক স্তন্যপায়ী প্রাণী, যিনি গল্প লেখেন,' 'মৃত্যু সম্পর্কে আমার অবস্থান খুব পরিষ্কার' এবং 'ওয়ানওয়ে টিকিট' গল্প তিনটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল; গ্রন্থিত হয়েছিল আমার 'নির্বাচিত গল্প' সংকলনে। 'মামলার সাক্ষী ময়না পাখি' শিরোনামটির জন্য আবদুল করিম খানের একটি পুঁথির কাছে আমি ঋণী।

শাহাদুজ্জামান
ফেব্রুয়ারি ২০১৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সূচি

জনৈক স্তন্যপায়ী প্রাণী, যিনি গল্প লেখেন	১১
মৃত্যু সম্পর্কে আমার অবস্থান খুব পরিষ্কার	১৭
টুকরো রোদের মতো খাম	২৭
চিন্তাশীল প্রবীণ বানর	৩৩
পৃথিবীতে হয়তো বৃহস্পতিবার	৪২
উবার	৫২
অপস্রিয়মাণ তির	৬২
ওয়ানওয়ে টিকিট	৭০
লবঙ্গের বঙ্গ ফেলে	৮৪
মমলার সাক্ষী ময়না পাখি	৯৬
নাজুক মানুষের সংলাপ	১০৭

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জনৈক স্তন্যপায়ী প্রাণী, যিনি গল্প লেখেন

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জন্য খেলা একটা জরুরি কর্মকাণ্ড। বিবর্তনের ইতিহাস বলে, খেলা তাদের প্রকৃতিতে টিকে থাকবার সম্ভাবনা বাড়ায়। সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জন্য অতএব শৈশবে খেলা বেঁচে থাকবার, বেঁচে উঠবার একটা অপরিহার্য শর্ত। বাস্তবের নকল করে এক কপট বাস্তব নিয়ে খেলা। বাঘশাবকেরা একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, কপট কামড় দেয় যেন একে অন্যের শত্রু, যেন সে শত্রুর মোকাবিলা করছে। এ নেহাত খেলা। এই খেলা তার বেড়ে উঠবার জন্য জরুরি। শিশু মানুষেরা খেলনা হাঁড়ি-পাতিলে রান্না করে, নকল মেহমান দাওয়াত দিয়ে ইটের তৈরি মাংসের তরকারি দিয়ে নকল খাওয়া খায়, তলোয়ার দিয়ে নকল যুদ্ধ যুদ্ধ খেলে। এই সব খেলা তার বেড়ে উঠবার জন্য প্রয়োজনীয়। শারীরতত্ত্ববিদেরা বলছেন, এই সব পয়েন্টলেস কিন্তু ইউজফুল কাজ তার জন্য দরকার। কিছু কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণীর অবশ্য শৈশব আর ফুরায় না তারা সারা জীবন শুধু খেলে। তারা কেবলই নকল পৃথিবীতে থাকে, বাস্তবে আর ঢোকে না। যেমন ধরা যাক কিছু মানুষ যারা গল্প লেখে। মানুষ নামের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ভেতর কেউ কেউ প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরও গল্প লেখার মতো পয়েন্টলেস অথচ পক্ষান্তরে ইউজফুল কাজটা করে। মতিন কায়সার তেমন একজন স্তন্যপায়ী প্রাণী।

তবে মতিন কায়সারের এইটুকু হুঁশ আছে যে গল্প লিখলেই তাকে গল্প বলা যায় না। গল্পের এই নকল পৃথিবীর ভেতরও আসল আছে, আবার নকলের নকল আছে। কেউ গল্প বানিয়ে তোলে, কারও গল্প হয়ে ওঠে। কোন গল্পটা বানিয়ে তোলা সেটা অন্তত মতিন কায়সার খুব ভালো বুঝতে পারে। কারও কারও গল্প পড়লে বুঝতে পারে এ একেবারে রঙ্গিনীর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে বানিয়ে তোলা। 'নব বিবিবিলাসে' যেমন প্রবীণা গণিকা নতুন গণিকাকে তালিম দিচ্ছে :

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তোমার রূপ লাবণ্য এ পর্যন্ত আছে তথাচ প্রত্যহ প্রাতে উবটান, বৈকালে সাবান দ্বারা অঙ্গ মার্জিত করিয়া দাঁতে মেশী ও মাথায় মাথাঘষা সোন্ধা দিয়া, আতর গোলাপ লাগাইয়া, গহনা পরিয়া উত্তম মিহি কাপড় পরিধান করিবা এবং প্রতি কথায় রঙ্গ দেখাইবা। যেন গায়ের লোমাদি এবং নিতম্বের প্রতিকৃতি দেখা যায় এইরূপ বেশভূষা করিয়া বাবুজনের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিবা। তুমি লোকের নিকট সম্ভ্রমে অম্বর সম্বরণ করিয়া অথচ সম্ভ্রমে ভ্রম উপলক্ষ করিয়া অঙ্গ ভঙ্গ আর আর রঙ্গস্থান সকলি দেখাইবা।

বহু গল্পে এই রকম রঙ্গস্থান দেখানোর প্রবণতা মতিন কায়সার লক্ষ করেছে। তার গল্প যাতে কিছুতেই তেমন বানিয়ে তোলা না হয়ে ওঠে, মতিন কায়সার সে ব্যাপারে সতর্ক থাকে। তবু এ-ও বোঝে তার গল্প ঠিক হয়ে ওঠে না।

মতিন কায়সারের এই হুঁশও আছে যে গল্পের মতো গল্পের পাঠক-পাঠিকার ভেতরও আসল আছে, নকল আছে। বিস্তর পাঠক-পাঠিকা আছে, যারা শুধু তাদের চেনা ভূগোলের গল্প খোঁজে। যে গল্পের ধরন-ধারণ, বিষয় অচেনা পৃথিবীর মনে হয় তারা সেগুলোকে এড়িয়ে চলে। চেনা পৃথিবীতে বিচরণ করতেই তারা স্বচ্ছন্দ বোধ করে। কিন্তু মতিন কায়সার অভিযাত্রী ধরনের পাঠক-পাঠিকাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। এমন পাঠক-পাঠিকা সে খোঁজে যারা নতুন মানচিত্রে পা রাখতে ভয় পায় না। এমন এক মানচিত্র যার নদী, পাহাড়, লোকালয় তাদের অপরিচিত। অনেক গল্প আছে একেবারে নিখুঁত, দারুণভাবে সুগঠিত, প্রতিটা শব্দ সুনির্বাচিত, গোছানো, মসৃণ কিন্তু সে গল্প মৃত। বরং খানিকটা অগোছালো, আপাত এলোমেলো কিন্তু জীবন্ত এমন গল্পই লিখতে চায় মতিন কায়সার। এমন গল্প লিখতে চায়, যেটা পড়ে পাঠক-পাঠিকার মনে হবে সে এমন এক দেশে গিয়ে পৌঁছাল, যেখানে সে আগে কখনো যায়নি। সেখানে যাওয়ার পথ আঁকাবাঁকা, বন্ধুর কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর পর মনে হবে, এলাম নতুন দেশে। কিন্তু তেমন নতুন দেশে যাবার গল্প লিখবার ক্ষমতা তার সম্ভবত নাই এমনই মনে হয় মতিন কায়সারের। আবার মনে হয় ক্ষমতা তো আপেক্ষিক। একজন বামনও পাহাড়ের ওপারের দিগন্ত দেখবার ক্ষমতা রাখে যদি সে কোনো দৈত্যের কাঁধে গিয়ে বসতে পারে। কিন্তু সে কি দৈত্য না দৈত্যসন্ধানী এক বামন, নিশ্চিত হতে পারে না মতিন কায়সার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মতিন কায়সার সেই বয়স পেরিয়ে এসেছে যখন মদ পান না করেও লোকে অবিরাম মাতাল থাকে। যখন তারা বস্তুত একেকটা পশু কিন্তু জানে না যে তারা পশু। একটা ষাঁড়ের মতো তখন তাদের শুধু ঘন ঘন শ্বাস পড়ে। জনৈক গ্রিক লেখকের মতো সেই বয়সে মতিন কায়সার প্রতিজ্ঞা করেছিল কাঁধে শক্ত জোয়াল বেঁধে সে বিস্তর মাটি চাষ করবে। কিন্তু দীর্ঘদিন পর এখন তার মনে হচ্ছে কাঁধে জোয়াল সে বেঁধেছে ঠিকই কিন্তু চাষ করেছে বাতাস। কিন্তু তাই বলে শুধু বাতাস চাষের এই পাগলামির জন্য তার কোনো আফসোস নাই। কোনো রকম পাগলামি ছাড়া যারা জীবন কাটিয়ে দেয়, তাদের জন্য করুণা হয় মতিন কায়সারের।

শায়লার সাথে তার সম্পর্ক একটা পাগলামিরই ফল। শায়লাকে এক বিকালে ছাদের কার্নিশে বসে মুখে লিচু পুরে চুষতে দেখে ভালোবেসে ফেলেছিল মতিন কায়সার। শায়লার কণ্ঠ এমন অদ্ভুত যে শুনলে মনে হবে ভোর হচ্ছে। মতিন কায়সার দীর্ঘদিন ফলভারে নুয়ে থাকা গাছের মতো অপেক্ষা করেছে কেউ এসে ফলগুলো পেড়ে তাকে ভারমুক্ত করুক। শায়লা তা করেছিল। শায়লার মাধ্যমেই মতিন কায়সার জানতে পারে মেয়েদের অন্য রকম ঘ্রাণ থাকে। শায়লার মাধ্যমেই প্রথম মেয়ের বোতাম খোলার অভিজ্ঞতা হয় তার। কিন্তু সেই সব তাকে কোথাও পৌঁছে দেয়নি। নারীর ঘ্রাণের ঘোর ধীরে ধীরে কেটে গেছে তার। তার মনে হয়েছে এর চেয়ে একটা হয়ে ওঠা গল্প লেখার সংগ্রাম আরও প্রহেলিকাময়।

সেই প্রহেলিকার কুয়াশা গায়ে মেখে নগরের বাতাসে একা একা হাঁটে মতিন কায়সার। তার মনে হয় যদিও সে চেয়েছিল কামড়কে চুম্বনে রূপান্তর করতে কিন্তু দেখেছে দিন শেষে লোকের আগ্রহ কামড়ানোতেই। চারিদিকের ঈর্ষা, গসিপ, এরোগেন্সের ক্যাকটাস কাঁটা পাশ কাটিয়ে সে অবশ্য একা একা নগরের বাতাসে হাঁটার কৌশল শিখে ফেলেছে। লোকে তাকে কখনো ভেবেছে গুপ্তচর, কখনো পাগল, কখনো ফেরিওয়ালা। বাসস্টপে যখন এক ভিক্ষুককে গান গাইতে শুনেছে, 'কেহই করে বেচা কেনা, কেহ কান্দে রাস্তায় পড়ে, ধরবি যদি তারে চলো মুর্শিদের বাজারে', তখন তার মনে হয়েছে বাজারে গিয়ে কেনাবেচার বদলে বরং রাস্তায় পড়ে যে লোকটা কাঁদছে, সেই লোকটাই আসলে সে, এই মতিন কায়সার। মুর্শিদের বাজারে গেলে লোকে তাকে ধরতে পারত। কিন্তু তাকে ধরবার ব্যাপারে লোকের কোনো আগ্রহ নাই। সে তাই রাস্তায় পড়ে কাঁদে। তার কখনো কখনো মনে হয় এই নগরের বাতাসও বুঝি তাকে উপেক্ষা করে। একদিন বাতাসকে কানে কানে মতিন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কায়সার জিজ্ঞাসা করে, হে বাতাস, তুমি কি মাটিতে মিশে থাকা ঘাসের চাইতে বিশাল বটগাছের সাথে বেশি মিষ্টি করে কথা বলো?

কনফেকশনারি দোকানের নানা কিসিমের বিস্কুটের প্যাকেটের মতো নানা কিসিমের গল্পে তার বিশ্বাস নাই। প্রগতিশীল গল্প, মাটিলগ্ন গল্প, উত্তর-আধুনিক গল্প নয়, সে শুধু একটা হয়ে ওঠা গল্প লিখতে চায়। সেই আশায় প্রাপ্তবয়স্ক শিশুর খেলার মতো লিখে চলে সে, ছাপায়ও। নিজের ছাপা লেখা কাউকে নাচিয়ে দেখাবার বালখিল্যতা তার নাই। কোনো বিপদের আশঙ্কা না করে চুপচাপ নিরীহ পাখির মতো যতই তার ছাপানো গল্প কোনো এক গাছের ডালে বসে থাকুক না কেন, পাখি শিকারির চোখে তা পড়েই এবং সেই পাখিকে গুলি করে মাটিতে না নামানো পর্যন্ত শিকারির যেন শান্তি নাই। কোনো প্রশংসা মতিন কায়সার প্রত্যাশা করে না, কারণ এ সত্য মতিন কায়সার বহু আগেই টের পেয়েছে যে লোকে ভাবে কাউকে প্রশংসা করা মানে একটা পরাজয়। ফলে অন্যের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে সে নির্বিকার। সে জানে সে একটা হয়ে ওঠা গল্প লেখার সংগ্রামে আছে। সে সংগ্রাম তার নিজেরই সঙ্গে। সে তার যাত্রা অব্যাহত রাখবে। কারণ, তার হিরু প্রবাদটা ভালো জানা আছে যে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে সারমেয় কুল যতই শোরগোল করুক ক্যারাভান চলে যাবে।

তারপরও কারও প্রতি কোনো ক্ষোভ নাই তার। সবার প্রতি বরাবর সদয় থাকে মতিন কায়সার। কারণ, কে জানে কী কারণে ক'র জন্ম হয়েছে এই পৃথিবীতে? ফলে সে সবকিছুর দিকে এমনভাবে তাকায় যেন দেখছে প্রথমবার এবং শেষবার। এভাবে তাকিয়ে দেখতে দেখতে তার বেশ ভালো বোঝা হয়ে গেছে যে কখনো কখনো বিজয়ী হওয়ার চেয়ে বিজিত হওয়া ভালো। তার জীবন সব মিলিয়ে বস্তুত খুবই সরল আর এ কারণেই লোকে মতিন কায়সারকে ভাবে খুবই কমপ্লিকেটেড। কিন্তু কাউকে কিছু ব্যাখ্যা কর'র স্পৃহা মতিন কায়সারের নাই।

গল্পে সে কোন সত্য খোঁজে সে ব্যাপারেও সে নিরুত্তর। কারণ, সত্যকে সে ঢাকঢোল পিটিয়ে পলাতক আসামির মতো খোঁজে না। সে অপেক্ষা করে কারণ সে জানে, বাঁকে বাঁকে সত্য তার কাছে আলতো করে এসে উপস্থিত হবে। সে অনেক আগেই টের পেয়েছে, পৃথিবীর সাথে তার সম্পর্ক প্রয়োজনের না, জ্ঞানের না, রূপ সৃষ্টির। সে টের পেয়েছে জ্ঞান তার দরকার কিন্তু তার দাস হিসেবে, প্রভু হিসেবে নয়। টের পেয়েছে জ্ঞান হলো বিভ্রম, সিদ্ধান্ত, সংশয়ের যুগলবন্দী। কোনো জ্ঞান, কোনো সত্যকে আঁকড়ে ধরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থাকার ইচ্ছাও তার নাই, কারণ সে জানে যে আঁকড়ে ধরলেই ফসকে যাবার সম্ভাবনা থাকে। মতিন কায়সার কোনো কিছু আঁকড়ে ধরে না, ফলে তার হাত থেকে কিছু ফসকেও যায় না। মতিন কায়সার জানে, সে জ্ঞান দিয়ে বাস্তবতায় ঢুকতে পারবে না, বাস্তবতাকে পুরোপুরি বুঝতে পারবে না, বদলাতেও পারবে না। ফলে সে ভেবেছে, এই সব অক্ষর সাজিয়ে সাজিয়ে গল্প লিখে যে চোখ সেই বাস্তবকে দেখে তাকে হয়তো খানিকটা বদলে দেবে। কিন্তু মতিন কায়সার এ-ও খুব ভালোমতো জানে যে এই অক্ষর সাজানো বড় মারাত্মক এক খেলা। এই খেলা ঘোরালো এক গোলকধাঁধায় ডেকে নিয়ে মাঝখানে ছেড়ে দেয়, তারপর ডাকেও না, পেছনে ফিরতেও দেয় না। দূর বনে কোথায় কোন আশ্চর্য ফুল ফুটেছে তার খবর যেমন শুধু মৌমাছি জানে, এ খেলার খেলোয়াড়েরাও জানে গোপন মধুর খোঁজ। কিন্তু মতিন কায়সার মৌমাছিকে তার নিজের তৈরি মধুতে ডুবে মরতে দেখেছে।

সেই হাসপাতাল ওয়ার্ডটার কথা মনে পড়ে মতিন কায়সারের। হাসপাতালের এই ওয়ার্ডের গল্প পুরোনো, সবাই জানে। সেই জানা গল্পই মাঝে মাঝে উঁকি দেয় তার মনে। হাসপাতালের ওয়ার্ডে পাঁচজন রোগী। সবাই মৃত্যুপথযাত্রী কে কোন দিন মারা যাবে তা জানা নাই কারও। সেই হাসপাতাল ওয়ার্ডে একটামাত্র জানালা। ফলে সেই জানালার পাশে যে রোগীটা শোয়া, শুধু সে ওই জানালা দিয়ে দেখতে পায় বাইরের দৃশ্য। বাকিরা শুয়ে থাকে বিছানায় দিনের পর দিন। যে রোগী জানালার পাশে, সে প্রতিদিন জানালায় দেখা দৃশ্যগুলো বয়ান করে তার শয্যাশায়ী সহরোগীদের। জানায় সেদিনের ভোরের সূর্যটা কতটা লাল, জানায় গাছের পাতা কেমন হলুদ থেকে সবুজ হয়ে উঠছে বলে দূরে নদীর পাড়ে কেমন নিবিড় বসে আছে এক প্রেমিক যুগল আর তাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে নীলকণ্ঠ পাখি। কোন কোন রাতের অন্ধকারে জানালার ওপাশে কিম্ভূত প্রেতেদের হেঁটে যাওয়ার দৃশ্যও বয়ান করে জানালামুখী রোগী। বাকি রোগীরা উদ্‌গ্রীব উত্তেজনায় সেই বয়ান শোনে, মনে মনে স্বপ্ন দেখে কোনো একদিন তাদেরও হয়তো সৌভাগ্য হবে ওই জানালার পাশের বিছানাটায় শোবার। তারপর একদিন হঠাৎ জানালার পাশের সেই কথক রোগী মারা যায়। তার মৃতদেহ সরিয়ে ফেলা হয় সৎকারের জন্য। শূন্য হয় জানালার পাশের সেই বিছানা। বাকি চার রোগী তখন উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করে কার সুযোগ ঘটবে ওই মহামূল্যবান বিছানায় যাবার। শুভ্র পোশাকে নির্বিকার নার্স এসে ওই বিছানার অধিবাসী নির্বাচনে লটারি করে। লটারিতে তৃতীয় রোগীটাই নির্বাচিত হয়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সেই কাঙ্ক্ষিত বিছানার অধিকারী হিসেবে। পরদিন তৃতীয় রোগীটাকে স্থানান্তর করা হয় জানালার পাশের ওই শূন্য বিছানায়। বিছানায় শুয়েই উত্তেজনায়, আবেগে বিভোর সেই তৃতীয় রোগী বহু প্রতীক্ষিত সেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। কিন্তু তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় সে। বিভ্রান্ত বোধ করে, কী ব্যাপার কিছুই বুঝে উঠতে পারে না সে। কারণ, ওই জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সে শুধু দেখতে পায় একটা উঁচু নিরেট দেয়াল। সে দেয়াল ভেদ করে কোথাও কিছু দেখা যায় না। বাইরে তাকিয়ে সে শুধু দেখতে পায় সাদা, শীতল একটা ইটের দেয়াল। আর কিছু না।

মতিন কায়সার জানে, জানালার পাশের সেই মৃত কথক রোগী বস্তুত সেই হয়ে ওঠা গল্পের গল্পকার, যে এই মৃত্যু চিহ্নিত পৃথিবীর নিরেট দেয়ালে অলীক পৃথিবীর ছবি এঁকে এঁকে সবার বাঁচার আশাকে জাগরূক রেখে নিজের তৈরি মধুতে ডুবে একদিন মারা যায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মৃত্যু সম্পর্কে আমার অবস্থান খুব পরিষ্কার

মৃত্যু সম্পর্কে আমার অবস্থান খুব পরিষ্কার, আমি এর ঘোর বিরোধী।

এই যে মানুষটা নানা নল, টিউব ইত্যাদির লতাগুল্মর ভেতর জড়িয়ে অচেতন হয়ে আইসিইউর বিছানায় শুয়ে আছে, সে আমার বাবা। আমার বাবা সেই মানুষ, যার একই দিনে দুইবার পকেটমার হয়েছিল। আমি নানা যন্ত্রপাতি দিয়ে ঢাকা আমার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

গত সপ্তাহে বাবার যখন জ্ঞান ছিল, বাবা আমাকে বলছিল, 'পলাশ, দ্যাখ, বুড়া হতে হতে আমার হাতের চামড়াগুলি কেমন বেগুন পোড়ার মতো হয়ে গেল।' আমি বাবার বেগুন পোড়ার মতো হাতের চামড়ায় হাত বুলিয়েছিলাম।

আমি বাবার কানের কাছে গিয়ে বলি, বাবা, আমি পলাশ, শুনতে পাচ্ছ?

বাবার নাকে-মুখে জটিল সব যন্ত্র, বাবার চোখ বোজা। এর ভেতরই বাবা মৃদুভাবে মাথা নাড়ায়। হ্যাঁ, আমার কণ্ঠস্বর বাবা শুনতে পাচ্ছে।

আমি ফিরে আসি ডাক্তারের চেম্বারে।

তার মানে বাবার সেন্স আছে? আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করি।

ডাক্তার: হ্যাঁ, ওনার ব্রেইন সচল আছে। ওনার অন্যান্য সব অঙ্গকে আমরা মেশিন দিয়ে চালু করে রেখেছি। উনি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছেন।

কয়েক মাস ধরে দেখতাম বাবা আমার পাঁচ বছরের ছেলে শায়ানের সঙ্গে একসাথে বসে শুধু নানা রকম কার্টুন ছবি দেখে। কার্টুন দেখতে দেখতে বাবা আর শায়ান দুজনে মিলে বিপুল হাসিতে গড়াগড়ি যায়।

র‍্যালি ব্রাদার্সের কুঠিগুলিতে হাইড্রোলিক মেশিনে পাটের পাকা গাঁইট বাঁধা হয়ে কী করে সরিষাবাড়ী থেকে ব্রিটেনের ডান্ডি শহরে চলে যেত, সে গল্প বাবা আমাকে করেছে। বাংলার সোনালি আঁশ তখন ভ্রমণ করছে পৃথিবীর দূরদূরান্তে। বাবার বর্ণনায় আমি দেখতে পেতাম, সরিষাবাড়ীর প্রত্যেক বাড়িতে রাখা পাট শুকানোর বাঁশের আরা আর দাঁড় করানো ঝুঁটিবাঁধা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাটসোলার সারি। বাবা চরের মানুষ, সমতলের মানুষ তাদের ডাকে 'চইরা'। বাবার তাতেই গর্ব, কারণ অবাধ পানির প্রাচুর্যে চর অঞ্চলের পাট সবচেয়ে সরেস। বাবা বর্ণনা করত, মোরগডাকা ভোরে বাড়ির কামলারা কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজ দিয়ে পান্তাভাত খেয়ে পানিতে নামত পাট ধুতে আর পানি থেকে উঠত মাগরিবের আজানের পর। বাবা অভিনয় করে কামলাদের পাট ধোয়ার নিপুণ ভঙ্গি আর কসরত দেখাত আমাকে। এক পাটগাছের কত বিবিধ ব্যবহার, তার বর্ণনা করত বাবা। পাটের কচি পাতা খাওয়া হতো নাইল্যা শাক হিসেবে, শুকনা পাটপাতা হতো রোগীর ওষুধ, গোড়ার পাটসোলা হতো জ্বালানি, আগার পাটসোলা ঘরের বেড়া আর সোনালি আঁশ পাট সরিষাবাড়ী থেকে চলে যেত দূর স্কটল্যান্ডের শহরে। এমনভাবে পাটের বর্ণনা দিত বাবা যেন কোনো স্বর্ণকেশী রূপকথার রাজকন্যার বর্ণনা দিচ্ছে। সরিষাবাড়ীর পাটের রূপ বাবাকে ঘোরগ্রস্ত করে রেখেছিল আজীবন।

ওই সরিষাবাড়ীর কাছেই জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে ফেরিতে উঠবার সময় একবার এবং নামবার সময় আরেকবার বাবার পকেটমার হয়েছিল।

আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করি, বাবার অবস্থা কি রিভার্সেবল?

ডাক্তার : ওনার ক্যানসার এখন ফোর্থ স্টেজে আর ওনার যে বয়স তাতে ওনার এই অবস্থা থেকে ফিরে আসবার সম্ভাবনা খুব কম।

পাটের মৌসুমে হাটের আগের দিন অনেক রাত জেগে পাট গোছগাছ চলত ছোট-বড় সব গৃহস্থ আর কৃষকের বাড়িতে। পরদিন সকালে হিড়িক পড়ত খাল, নদী থেকে ডোবা নৌকা তোলার। যাদের নৌকা নাই তারা নৌকাওয়ালাদের নৌকা তুলে লগি, বইঠা, দড়ি-কাছি, বাদাম নৌকায় তুলে বাইতে সাহায্য করত। সকালে কড়কড়া ভাতকে চুলার পাশে রেখে তাতানো শুকনা মরিচ মেখে টকটকা লাল করা হতো, সেই রক্তিম, তীব্র ঝালভাত খেয়ে গ্রামের কয়েক শরিকের নৌকা একসঙ্গে রওনা হতো হাটের উদ্দেশে। নৌকা হালট, খাল, বিল পার হয়ে পড়ত যমুনা নদীতে। নদীতে পড়ার ঠিক সেই মুহূর্তে নৌকার সবাই একসঙ্গে বলে উঠত, 'আল্লা আল্লা রসুল বলো, আল্লা আল্লা রসুল'। নদীতে পাল তোলা নৌকার বহরে একটা অলিখিত প্রতিযোগিতা চলত। গৃহস্থরা তাদের ব্যাপারী নৌকায় পাট বোঝাই করে সরাসরি দিত কুঠিতে। মাপামাপি চলত সেই পাটের। মাপত কয়ালেরা। তারা মন্ত্রের মতো মাপতে মাপতে বলত লাবে লাব, লাবে দুই, লাবে তিন, লাবে চার...। একেক পাটের একেক দাম, তোষা, বটম, ক্রস বটম। পাট বিক্রি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শেষে শুরু হতো হাটবাজার। চলত বিস্তর সদাইপাতি। নিত্য দরকারি জিনিসের সাথে বাচ্চাদের বাঁশের খেলনা, ছেলেদের গেঞ্জি, লুঙ্গি আর মেয়েদের শাড়ি, ডাপটা, চুড়ি, আলতা। আর সবার সদাইয়ের ঝাঁকায় একটা অনিবার্য আইটেম, লোনা ইলিশ, লবণ মাখানো শুকনা ইলিশ। সবার বাজার শেষে একসঙ্গে ঘাট ছাড়ত নৌকা। বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক রাত। ঘরে অপেক্ষমাণ মেয়েরা, বাচ্চারা। হাট থেকে ফিরতে যত রাতই হোক সাদা হয়ে যাওয়া পোক্ত চালকুমড়া ব্যাপক ঝাল দিয়ে লোনা ইলিশ রান্না করা হতো। তারপর হারিকেনের আলোয় সবাই মিলে কলরব করতে করতে নিশুতি রাতে ঝাল ঝোলে রান্না লোনা ইলিশের তরকারি দিয়ে ভাত খাওয়া হতো। বাবা এসব এমনভাবে বর্ণনা করত যেন কোনো থিয়েটারের বর্ণনা দিচ্ছে।

আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করি : বাবার কি কষ্ট হচ্ছে?

সাদা অ্যাপ্রোন পরা নির্বিকার ডাক্তার বলেন : হ্যাঁ, হচ্ছে।

আমি : এই যে ভেন্টিলেটর, টিউব—এগুলোতে কষ্ট হচ্ছে বাবার?

গম্ভীর ডাক্তার : হ্যাঁ, হচ্ছে।

আমি : তাহলে এসব যন্ত্রপাতি দিয়ে কী লাভ?

ডাক্তার : এসব যন্ত্রপাতি তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এসব মেশিন উইথড্র করলে উনি মারা যেতে পারেন।

আমি বলি : আমি আমার নাম বললে বাবা মাথা নাড়ে। আমি কি এভাবে যতবার আমার নাম বলব, বাবা ততবার মাথা নাড়বেন?

ডাক্তার তাঁর স্টেথো গলা থেকে নামিয়ে বলেন, হ্যাঁ, তা নাড়বেন।

ছোটবেলায় একবার গ্রামের বাড়ি গেলে সেই যমুনা নদীতে বাবা আমাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল, আমাকে সাঁতার শেখাবার জন্য। আমি পানিতে পড়ে হাঁসফাঁস করছিলাম, আমার তীব্র শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। আর বাবা তীরে দাঁড়িয়ে হাসছিল। বাবাকে খুব নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল আমার। আমি যখন প্রায় ডুবতে বসেছিলাম তখন বাবা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আমাকে কোলে তুলে এনেছিল। বাবার কি এখন ঠিক তেমন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে যেমন আমার হয়েছিল যমুনার পানিতে? আমি কি ঝাঁপ দিয়ে এখন বাবাকে তুলে আনতে পারি তীরে?

গত সপ্তাহে যখন কথা হচ্ছিল, বাবা আমাকে আরও বলেছিল, তোর মা আগে মরে গিয়ে ভালোই হয়েছে, না হলে তার হাতের চামড়া আমার মতো এমন বেগুন পোড়ার মতো হতো।

বাবা আমাকে গ্রিক দেবী ইয়োসের গল্প বলেছিল। ইয়োস ভোরের দেবী, যাঁর আঙুলগুলো গোলাপি। ইয়োস প্রেমে পড়েছিলেন মানুষ টিথোনাসের।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ইয়োস তো দেবী, যিনি অমর অথচ মানুষ টিথোনাসের মৃত্যু ঘটবে একদিন। তাঁর প্রেমিক একদিন মারা যাবে এ সত্য কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না ইয়োস। ভোরের দেবী ইয়োস দেবতা জিউসের কাছে প্রার্থনা করলেন, টিথোনাসও যেন তাঁর মতো অমরত্ব লাভ করে। জিউস ইয়োসের ইচ্ছা পূরণ করলেন। টিথোনাসকে অমরত্বের বর দিলেন তিনি। আনন্দে, উচ্ছ্বাসে, প্রেমে দিন কাটে ইয়োস আর টিথোনাসের, বছরের পর বছর কাটে। তারপর হঠাৎ একসময় ইয়োস লক্ষ করেন, টিথোনাসের বয়স বাড়ছে, টিথোনাস ক্রমশ প্রৌঢ় থেকে বৃদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু ইয়োস রয়ে গেছেন অনন্ত যৌবনবতী। ইয়োসের বোধোদয় হয়, সে টের পান যে ভুল হয়ে গেছে। জিউসের কাছে টিথোনাসের অমরত্বের বর চাইলেও চিরযৌবনের বর তো তিনি চাননি। জিউসের কাছে একাধিক বর চাইবার আর উপায় নাই। ফলে চিরযৌবনা ইয়োসের চোখের সামনে টিথোনাস একটু একটু করে বার্ধক্যে নুয়ে পড়তে থাকে। টিথোনাস মরে না কিন্তু থুথুরে বুড়ো হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে তার আর কথা বলবার শক্তি থাকে না, চলবার কোনো শক্তি থাকে না। একটা বিছানায় স্থির হয়ে শুয়ে থাকে টিথোনাস আর শুধু নিজের মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু মৃত্যু তার হয় না। ইয়োস মনে গভীর দুঃখ নিয়ে অমর টিথোনাসের দিকে তাকিয়ে চোখের পানি ফেলেন। অমরত্বকে তখন তাঁর মনে হয় এক অভিশাপ।

বাবা বলে, তোর মা-ও আমার প্রেমে পড়েছিল। ইয়োসের মতোই তোর মায়ের আঙুলগুলো ছিল গোলাপি। সে আগে মরে ভালোই হয়েছে। সে ইয়োসই থেকে গেল, আমার এই টিথোনাসের রূপ তাকে দেখতে হলো না আর।

আমি ডাক্তারকে আবার জিজ্ঞাসা করি বাবা কি আর ফিরবে?

ডাক্তার নির্বিকার বলেন : সে সম্ভাবনা কম

আমি : তাহলে এসব যন্ত্রপাতি দিয়ে কী লাভ?

ডাক্তার : তাঁর লাইফটা আরেকটু প্রলং হলো।

আমি : তাতে কি উনি ফিরবেন?

ডাক্তার : সেটা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবে তিনি বেঁচে থাকবেন।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করি : আমি কানের কাছে গিয়ে যখন বলব আমি পলাশ, উনি তখন মাথা নাড়বেন?

ডাক্তার আবার বলেন : হ্যাঁ, তা নাড়বেন।

আমি : কিন্তু আর কখনো উঠে দাঁড়াবেন না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার সামনের কাগজে সই করতে করতে বলেন : সম্ভাবনা খুব কম।

আমি : তাহলে এই যন্ত্রপাতি দিয়ে কী লাভ হবে?

ডাক্তার বিরক্ত না হয়ে পুনরাবৃত্তি করেন : তিনি আরও কিছুদিন বাঁচলেন।

আমি : ওই বিছানায়, ওই যন্ত্রপাতি নিয়ে?

ডাক্তার : হ্যাঁ।

আমি : এসব যন্ত্রপাতি নাকে-মুখে দেওয়া থাকলে তিনি কষ্ট পাবেন?

ডাক্তার : হ্যাঁ, তা পাবেন।

আমি ঘোরানো সিঁড়ির মতো প্রশ্ন করে চলি : তবু তিনি বেঁচে থাকবেন?

ডাক্তার হ্যাঁ, তা থাকবেন।

আমি : তাতে কী লাভ?

ডাক্তার কোনো উত্তেজনা না দেখিয়ে বলেন : লাভ মানে মেডিকেল সায়েন্স আপনাকে একটা অপশন দিচ্ছে তার লাইফ প্রলং করার। আপনি চাইলে সেই অপশন নিতে পারেন, না-ও নিতে পারেন। না নিতে চাইলে আমরা লাইফ সাপোর্ট খুলে নেব।

আমি : তখন উনি মারা যাবেন?

ডাক্তার : হ্যাঁ, সে আশঙ্কাই বেশি। আবার সারভাইভ করেও যেতে পারেন।

বাবা আমাকে গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী গান শুনিয়েছিল :

চল্ কোদাল চালাই
ভুলে মানের বালাই
ঝেড়ে অলস মেজাজ
হবে শরীর ঝালাই
যত ব্যাধির বালাই
বলবে পালাই পালাই
পেটে ক্ষুধার জ্বালায়
খাব ক্ষীরের মালাই

বাবা আমাকে বলেছিল,
উত্তর দুয়ারী বাড়ি,
দিঘল ঘোমটা নারী,
পানার তলের শীতল জল,
তিনই মন্দকারী।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাবা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষার কথা তার বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মনে রেখেছিল। বাবা আমাকে শোনাত 'কর কর খর খর গর গর ঘর ঘর, ধর বচন কর রচন, কানাকে কানা খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না তাহা বলিলে তাহারা মনে দুঃখ পায়, উহঃ মেঘের ডাকে কান ফাটিয়া যায়।'

আমি ডাক্তারকে বলি : মেডিকেল সায়েন্স শুধু অপশন দিচ্ছে লাইফকে প্রলং করা মানে অন্যভাবে বললে ডেথকে ডিলে করার, লাইফে ফিরিয়ে আনার না?

ডাক্তার : কেউ কেউ ফেরে কিন্তু আপনার বাবার ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা কম।

আমি : উনি কত দিন এভাবে থাকতে পারেন?

ডাক্তার : সেটা বলা মুশকিল। আজকেও অবস্থা ডেটরেট করতে পারে আবার এক মাসও সারভাইভ করতে পারে।

বাবার এটা তৃতীয় দিন।

বাবা বলেছিল, সরিষাবাড়ী বাজারের হরিপ্রসাদ আগরওয়ালার পাটের গুদাম পরিষ্কার করে টকি বায়োস্কোপ চালানো হয়েছিল। সেখানে বাবা *হান্টারওয়ালী* ছবিটা দেখেছিল। নায়িকার নাম নাদিরা বেগম। আশপাশের গ্রাম ভেঙে লোক এসেছিল টকি দেখতে। গুদামের দরজা খোলা, ভিতরে-বাইরে লোক ঠাসাঠাসি, বিজলিবাতি দেখে সবাই তাজ্জব। ডায়নামোর ভট্ ভট্ শব্দের সাথে সাথে বিজলিবাতি জ্বলে ওঠে, আবার পর্দায় ছবি ভেসে ওঠার সাথে সাথে সব বাতি নিভে যায়। এক মহাকাণ্ড। বাবা দেখল একটা মেয়ে লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চাবুক ঘোরাচ্ছে। ঘোড়া করে কিছুদূর যেতেই দুম করে ফিতা ছিঁড়ে গেল। ডায়নামো বন্ধ হয়ে গেল। চারিদিক অন্ধকার, কিন্তু হলে পিনপতন স্তব্ধতা। কখন আবার বাতি জ্বলে উঠবে, পর্দায় ছবি ভাসবে, সে জন্য সবার অধীর অপেক্ষা। প্রজেক্টর ম্যান ব্রজ বাবু হাঁকডাক দিয়ে ছেঁড়া ফিল্ম জোড়া লাগাবার চেষ্টা করতে লাগলেন সবাই ব্রজ বাবুর প্রতিটা নড়াচড়া বিস্ময়ের সাথে দেখছে। ব্রজ বাবু যেন দেবদূত

আমি ডাক্তারকে বললাম : প্রতিদিন আইসিইউর খরচ চল্লিশ হাজার টাকা।

ডাক্তার : হ্যাঁ।

আমি : প্রতিদিন এই পরিমাণ টাকা দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

ডাক্তার : সেটা আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন। আপনারা বললে আমরা লাইফ সাপোর্ট খুলে নিব।

আমি : কিন্তু মেডিকেল সায়েন্স তো বাবার লাইফকে প্রলং করার একটা অপশন দিয়েছে?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : হ্যাঁ।

আমি : এই অপশনটা সন্তান হিসেবে গ্রহণ করা আমার নৈতিক দায়িত্ব, তাই তো?

ডাক্তার : সেটা আপনার ব্যাপার।

আমি : যদিও আমি এ খরচ বহন করতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাব?

ডাক্তার : সেটা আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন।

আমি : এই অপশনটা না থাকলে তো আমার এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হতো না। যদিও এই অপশন বাবাকে আবার সুস্থ করে ফিরিয়ে দেবে না।

ডাক্তার : সে সম্ভাবনা কম। তারপরও কিছু বলা যায় না।

আমি : হয়তো আরও দুই দিন, তিন দিন কিংবা দুই সপ্তাহ এই মেশিনের ভেতর থাকবে বাবা।

ডাক্তার : হয়তো তার চেয়েও বেশি, কিম্বা তার চেয়েও কম।

আমি : একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন-মৃত্যুর সীমানায় বাবা এভাবে ঝুলতে থাকবে?

ডাক্তার : তা বলতে পারেন।

আমি : তারপরও এভাবে রেখে দিলে আমি জানব যে বাবা বেঁচে আছে?

ডাক্তার : হ্যাঁ, তাই।

আমি : যদিও বাবা আমাদের মধ্যে ফিরে আসবার সম্ভাবনা নাই বললেই চলে।

ডাক্তার : হ্যাঁ, সেটা ঠিক।

আমি : তবু প্রতিদিন চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব, তাই তো?

ডাক্তার : সেটা আপনি বুঝবেন।

আমি : মেডিকেল সায়েন্স জীবন-মৃত্যুর কোনো সমাধান দিতে পারছে না কিন্তু আমাদের একটা নৈতিক দ্বিধার ভিতর ফেলে দিচ্ছে, তাই না কি?

ডাক্তার : আপনি আমার অনেক সময় নিচ্ছেন। আমি ব্যস্ত আছি। আপনি বাইরে গিয়ে বসেন।

বাবার হাতের চামড়াগুলো পোড়া বেগুনের মতো হয়ে গিয়েছিল। মার চামড়াও পুড়ে গিয়েছিল কিন্তু সেগুলো বেগুনের মতো হয়েছিল কি না সেটা দেখবার সুযোগ আমাদের হয়নি, মার সারা শরীর ব্যান্ডেজে ঢাকা ছিল। ঘটনাটা আমি আমার চোখের নিচ থেকে কখনোই সরাতে পারি না। অবিরাম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তা ফুটে থাকে। আমরা টেলিভিশন দেখছিলাম, তখন সাদাকালো টিভির যুগ। বাবা, মা আর আমি টেলিভিশনের সামনে বসে। পাশের ঘরে বোন পারুল মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। পারুলের ক্লাস ফাইভের বৃত্তি পরীক্ষা চলছে। টেলিভিশনে মাহমুদুন্নবী গান গাইছিলেন, 'শিল্পী আমি তো নই, তবুও এসেছি আজ শোনাতে যে গান এই জলসায়...।'

বাবা বলল : শিল্পী না তো তুমি এসেছ কেন বাবা গান শোনাতে? বলে হো হো করে হাসতে লাগল।

মা বলল : পলাশ, তোর বাবার সবকিছু নিয়েই ফাইজলামি।

আমরা আবার গান শুনতে থাকি, 'ক্ষমা করে দিও যদি মনের মতো গান শোনাতে না পারি...

এ সময় হঠাৎ মা বলল : বেচারা পারুলটা সেই সন্ধ্যা থেকে পড়ছে। ওকে একটু এক গ্লাস দুধ গরম করে দিয়ে আসি।

বাবা বলল : যাও, যাও বেচারা মেয়েটা পড়তে পড়তে কাহিল হয়ে গেল।

আমি টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে গান শুনতে লাগলাম। মা তার খুব পরিচিত ভঙ্গিতে আঁচলটা টেনে হেঁটে গেল রান্নাঘরে। আমি আর বাবা টিভিতে গান শুনছি। আর তখনই আমরা রান্নাঘর থেকে বিকট চিৎকারটা শুনতে পেলাম। বাবা আর আমি ছুটে গেলাম। মা গ্যাসের চুলা জ্বালাতে লাইটারটা অন করতেই দপ করে আগুন জ্বলে উঠে লেগে যায় মার শাড়িতে। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে মার শাড়ি। পানি ঢেলে, কাপড় দিয়ে চেপে ধরে বাবা আগুন নেভায় কিন্তু ততক্ষণে পুড়ে গেছে মার সারা শরীর, নিস্তেজ হয়ে গেছে মা। হাসপাতালে নেওয়া হলো মাকে। মার শরীরের প্রায় আশি ভাগ পুড়ে গিয়েছিল। আর কোনো কথা বলতে পারেনি মা। দশ দিন পর মা মরে গেল। টেলিভিশন দেখতে দেখতে, গান শুনতে শুনতে, ঠাট্টা করতে করতে, দুধ গরম করার মতো অকিঞ্চিৎকর একটা কাজ করতে করতে মরে গেল মা।

বাবা বলেছিল তাদের সরিষাবাড়ী বাড়ির কাছারি প্রাঙ্গণে বিরাট বিরাট বকুল আর ঝাউগাছ ছিল। বাতাসে ঝাউগাছের শন্ শন্ শব্দ অনেক দূর থেকে শোনা যেত। সকালবেলায় শিশিরভেজা ঘাসের ওপর ঝরা বকুল দেখে মনে হতো কেউ যেন সাদা চাদর বিছিয়ে রেখেছে। কে কার আগে ঘুম থেকে উঠে বকুল ফুলের মালা গাঁথবে এ নিয়ে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে যেত। বাবার শৈশবের খেলার সাথি গীতি, মীরা, বীণা, জান্নাত আরা অন্ধকার থাকতে বকুলতলায় গিয়ে ফুল কুড়াতে শুরু করত। আর বাবা সাখাওয়াত, মতি, টুকু পরে যোগ দিত তাদের সঙ্গে। লম্বা লম্বা পরগাছা লতা দিয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একসঙ্গে মালা গাঁথত। তারা যখন মালা গাঁথছে, উঁচু গাছ থেকে বকুল ফুলগুলো ওলটানো খোলা ছাতার মতো উড়ে উড়ে এসে বাবা আর তার বন্ধুদের মাথার ওপর পড়ত। যেন তুষারবৃষ্টি হচ্ছে।

গত সপ্তাহে আমি যখন বাবার বিছানায় বসে তার বেগুন পোড়া চামড়ায় হাত বোলাচ্ছি; বাবা বলেছিল, আমার কি মনে হয় জানিস? রাস্তার পাশে দাঁড়ায়ে সবার কাছে ভিক্ষা চাই, বলি আপনার জীবন থেকে পাঁচটা মিনিট আমাকে দিয়ে দেন। একজনের জীবনে পাঁচ মিনিট দিয়ে দিলে তাদের তো কিছুই হবে না কিন্তু এমন অনেকে যদি আমাকে পাঁচ মিনিট করে দেয়, আমি হয়তো আরও একটা বছরের আয়ু পেয়ে যেতে পারি। বেঁচে থাকা মানে তো মানুষকে ভালোবাসতে পারার একটা সুযোগ, হয়তো মানুষের ভালোবাসা পাওয়ারও একটা সুযোগ। মনভরা এত ভালোবাসা নিয়ে তোর মা তো সেই সুযোগ পেল না।

ডাক্তার বলে: আমরা আপনার বাবার ব্যাপারে একটা এটেম্পট নিয়ে দেখতে চাই। আমরা ট্রায়াল বেসিসে কিছু সময়ের জন্য তার ভেন্টিলেটর উইথড্র করে দেখতে চাই। আপনি কালকের মধ্যে আমাদের এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত জানাবেন।

আমি: উইথড্র করলে কী হবে?

ডাক্তার: উনি সারভাইভ করতে পারেন, আমরা দেখব কতক্ষণ উনি নিজের শক্তিতে শ্বাস নিতে পারেন। আবার অনেক সময় ভেন্টিলেটর উইথড্র করলে পেশেন্ট ইমিডিয়েটলি মারাও যেতে পারে। সে রিস্কও আছে। আপনি কনসেন্ট দিলে আমরা একটা চেষ্টা করব।

একটা চেনা সিঁড়ি দিয়ে উঠে পরিচিত দরজাটা পাওয়া গেল। চাবি দিয়ে পরিচিত দরজাটা খোলা গেল। তারপর দেখা গেল, দরজার ওপাশে আর কোনো ঘর নাই, সিঁড়ি নাই, কিছু নাই। একটা গভীর খাদ। আর এক পা এগোলেই সেই খাদে পড়তে হবে। বাবা কি দরজার চাবি খুলে তেমন একটা খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে?

আমি অনুমতি নিয়ে সেদিনের মতো শেষ আরেকবার মাস্ক, গাউন পরে আইসিইউতে বাবার কাছে যাই। বাবাকে বলি, আমি পলাশ, শুনতে পাচ্ছ?

বাবা মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ, পাচ্ছে।

আমি বাসায় ফিরে আসি। ঘরে ঢুকবার পর আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। আমি জানালায় গিয়ে দাঁড়াই। তুমুল বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে রাস্তাঘাট, মানুষ, গাড়ি। মনে হচ্ছে আজকে এক দিনেই আকাশ পৃথিবীর কাছে তার সবটুকু ঋণ শোধ করে দেবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাবা টিউব, ভেন্টিলেটরের লতাগুল্ম নিয়ে সিঁড়ির খাদে। আমি কাল বাবার কাছে গিয়ে আবার বলতে পারি, বাবা আমি পলাশ, শুনতে পাচ্ছ? বাবা আবার মাথা নেড়ে বলবে, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছে। আমি জানব বাবা বেঁচে আছে। এই দৃশ্যটুকু আমি মঞ্চস্থ করে যেতে পারি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। আমি আমার নাম বলব, বাবা তার মাথা নাড়বে, আমি জানব বাবা বেঁচে আছে। বাবার বেঁচে থাকা মানে যদিও ওই মাথা নাড়াটুকু। বাবার ওই মাথা নাড়ানোর মূল্য প্রতিদিন চল্লিশ হাজার টাকা। আমরা এই অর্থ জোগান দেবার জন্য নিঃস্ব হয়ে যাব। কিন্তু বাবার জীবনের বিপরীতে টাকার এই হিসাব মর্মান্তিক, অমানবিক, স্বার্থপর। কিন্তু এই জটিল যন্ত্রপাতি কি বাবাকে টিথোনাসের মতো অমরত্ব দিতে পারবে? দিতে পারলেও বাবা কি সে সুযোগ গ্রহণ করতে চাইবে? আমি কালকে ডাক্তারকে বলতে পারি, হ্যাঁ, ভেন্টিলেটর খুলে দেন, দেখা যাক বাবা নিজের মতো শ্বাস নিতে পারে কি না। ভেন্টিলেটর খুলে নেবার পর বাবা বুকভরে শ্বাস নিতে পারে আবার ভেন্টিলেটর খুলবার সাথে সাথে বাবা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারে। আমাকে আগামীকাল এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে।

একদিন দেখি বাবা আর আমার পাঁচ বছরের ছেলে শায়ান বসে ওয়াল্ট ডিজনির একটা কার্টুন ফিল্ম দেখছে। একটা হাঁসের ছানা ঝড়ে উড়ে গিয়ে এক গর্তে পড়েছে, আর উঠতে পারছে না। মা হাঁস ঝড়বাদলে জঙ্গলের ভেতর আকুল হয়ে ছানাকে খুঁজছে। পাচ্ছে না। দেখি আমার ছেলে শায়ানের চোখ বেয়ে পানি পড়ছে। দেখি আমার বাবার চোখ বেয়েও পানি পড়ছে। এক হারিয়ে যাওয়া হাঁসের ছানার জন্য দাদা আর নাতি বসে টেলিভিশনের পর্দার সামনে বসে অঝোরে কাঁদছে।

আমি আবারও স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই যে মৃত্যু সম্পর্কে আমার অবস্থান খুব পরিষ্কার, আমি এর ঘোর বিরোধী।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

টুকরো রোদের মতো খাম

হলুদ খামটা হাতে নিয়ে আন্দালীবের মনে হয় যেন ধরে আছে এক টুকরো চৌকো রোদ।

চিঠি প্রজন্মের মানুষ সে। খামে ভরা চিঠি স্পর্শ করলে তার মনে হয় যেন সপ্তডিঙ্গায় নাও ভাসিয়ে চলে গেছে চেনা অথচ হারিয়ে যাওয়া কোনো দ্বীপে। তার মনে হয় স্পর্শ করে আছে আরেকজন মানুষকে। খামের ভেতর শৃঙ্খল-বিশৃঙ্খল বিবিধ হাতের লেখা। মানবিক অসম্পূর্ণতায় মোড়া। কি-বোর্ডের অক্ষরের মতো নিপাট, নিখুঁত না। কণ্ঠস্বরের মতো, হাসির মতো ভিন্ন একেকজনের হাতের লেখা। তার যে বন্ধু মুক্তাগাছা থেকে তাকে বরাবর সবুজ কালিতে চিঠি লিখত, সে এখন স্টুটগার্ট থাকে। দূর দ্রাঘিমায় বসে আন্দালীবকে ই-মেইল লেখে সে। এক ক্লিকে সেই বৈদ্যুতিক চিঠি ডিগবাজি খেয়ে হাজির হয় আন্দালীবের কম্পিউটার পর্দায়। চোখের সামনে সৈনিকের মতো সারি বাঁধা চৌকস অক্ষর দেখে সে। কিন্তু সেই সবুজ বন্ধুকে সে অক্ষরের ভেতর আর দেখতে পায় না।

এ মুহূর্তে সরকারি নকশার যে হলুদ খাম হাতে নিয়ে আন্দালীব বসে আছে, সেটা এক অচেনা লোকের লেখা। এ চিঠির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নাই। তবু চিঠিটা হাতে নিয়ে তার বুক কাঁপে। বুকের ভেতরে কেমন এক জলোচ্ছ্বাসের শব্দ পায় যেন।

বড় করপোরেটের কর্মকর্তা সে ঠিকই কিন্তু মাথায় আন্দালীবের খেয়াল পোকা নড়ে। সে বুঝিবা করপোরেট বাউল। কোন বর্ষার দিনে একাই স্কোডা গাড়ি ড্রাইভ করে সে চলে যায় হাওর এলাকায়। স্ত্রীকে বলে, 'চললাম, মোবাইল অফ থাকবে।'

তারপর কোন জেলেনৌকায় উঠে হাওরেই ঘোরে মাঝিদের সাথে। অচেনা মাঝিদের সাথে মিলে শোল মাছের ঝোল খায়। বাড়ি ফেরে সন্ধ্যায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে আকাশে দেখে বিশাল চাঁদ। তার মন কেমন আনচান করে ওঠে। নিজেকে প্রবোধ দেয় আন্দালীব, পাগলা মনটারে তুই বাঁধ। আকাশে চাঁদ অমন করে হেসেই থাকে, ওটা কোনো ব্যাপার না।

কিছুকাল আন্দালীবের মন উতলা হয়েছে চিঠির অতীতে ফিরে যাবার। মনে হয়েছে দারুণ হতো যদি কবুতরের পায়ে বাঁধা একটা চিঠি পাওয়া যেত। যেমন পেত মোগল রাজরাজড়ারা। কিম্বা ঝুম ঝুম ঘণ্টা বাজানো সুকান্তের রানারের হাত থেকে কোনো চিঠি। কিন্তু জানে সেটা হবার নয়। ফলে অন্তত খামে ভরা চিঠি দেখবার জন্য লোভ হয় তার। দাপ্তরিক, টাইপ করা চিঠি নয়। গরম তাওয়া থেকে নামানো রুটির মতো সতেজ আনকোরা হাতে লেখা কোনো চিঠি। হলুদ খামে ভরা রহস্যঘেরা চিঠি দেখবার ইচ্ছা জাগে তার। কিন্তু তাকে কেউ আর চিঠি লেখে না এখন, শুধু ই-মেইল করে। তার পরিমণ্ডলে কাউকে সে চেনে না যে হাতে ব্যক্তিগত চিঠি লেখে। হাতে লেখা চিঠি দেখবার ক্ষুধা তাকে কাবু করে।

'এই রাজীব, লোকে কি আজকাল চিঠি লেখে রে?'—পোস্ট অফিসে কাজ করা এক আত্মীয়কে ফোন করে আন্দালীব।

'লেখে তো মামা। গ্রামে-গঞ্জে কত মানুষের আর ই-মেইলে অ্যাকসেস আছে বলো? যদিও লোকে এখন মোবাইলেই কথা বলে। তবু গ্রাম মফস্বলের গরিব মানুষেরা এখনো কিছু চিঠি লেখে। তুমি পোস্ট অফিসে আসো একদিন, দেখতে পাবা।'

অফিস ফাঁকি দিয়ে তার স্কোডা চালিয়ে একদিন প্রধান পোস্ট অফিসে হাজির হয়ে যায় আন্দালীব। রাজীব তাকে পোস্ট অফিস ঘুরে দেখায়। বহুদিন পর অনেক হলুদ রঙের চৌকা খাম দেখে কেমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ে আন্দালীব।

'মামা, পোস্ট অফিস তো আর এখন আগের মতো তেমন জমজমাট না। তবু দেখো, কম লোকে চিঠি লেখে না কিন্তু।'

আন্দালীব খামগুলো নেড়েচেড়ে দেখে।

এ সময়ে পোস্ট অফিসের মেঝের এক কোনায় রাখা কিছু চিঠির দিকে তাকিয়ে রাজীব বলে, 'মামা, এই যে খামগুলো দেখছ এগুলো সব আনডেলিভারেবল, বেওয়ারিশ। হয় ঠিকানা ভুল লেখা কিম্বা প্রাপক নাই। এগুলো আমরা ফেলে দিব। তুমি এক কাজ করো, এই চিঠিগুলো নিয়ে যাও। তুমি হাতের লেখা দেখতে চাচ্ছিলে। চিঠিগুলো খুলে দেখতে পারো। এসবই ডেফিনিটলি হাতের লেখা। ফেলেই যখন দিব তখন এই চিঠি পড়লে আর অসুবিধা কী? তোমার তো স্ট্রেঞ্জ সব বিষয়ে কিউরিওসিটি। তুমি বরং

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চিঠিগুলো নিয়ে যাও।'

তার এই প্রস্তাবে যারপরনাই আনন্দিত হয় আন্দালীব। বলে, তাহলে তো দারুণ হয়। থ্যাংকস আ লট রাজীব। চিঠিগুলো আমি নিলাম।

একটা ব্যাগে ভরে অনেকগুলো আনডেলিভারেবল চিঠি বাড়ি বয়ে আনে সে। তারিয়ে তারিয়ে একেকটা খাম খুলবার রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় থাকে। নিজের স্টাডিতে গিয়ে দরজা বন্ধ করে চিঠিগুলো টেবিলের ওপর রাখে। নেড়েচেড়ে দেখে। প্রাপকের নাম, প্রেরকের নাম দেখে। তখনই এই বিশেষ খামে চোখ আটকে যায় আন্দালীবের। সে খামটা হাতে তুলে নেয় আন্দালীব। তার মনে হয় যেন হাতে ধরে আছে এক টুকরো চৌকো রোদ।

প্রাপক
মোহাম্মদ সোহেল মিয়া
C/O হ্যান্ডসাম ড্রেসার সেলুন
৮৭ মিরাজ কমপ্লেক্স
উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২

প্রেরক
মোহাম্মদ শাহীন মিয়া
ফাঁসির আসামী। রেজি নং ৮৮০২৭/বি সেল
বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার
বরিশাল

খামটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ থাকে আন্দালীব। তারপর ধীরে ধীরে চিঠিটা খোলে। নীল বল পয়েন্টে লেখা সরু সরু অক্ষর। লাইন একদিকে শুরু হয়ে বেঁকে চলে গেছে অন্যদিকে। ভুল বাক্য, ভুল বানান। চিঠিটা হাতে নিয়ে আন্দালীবের বুক কাঁপে। বুকের ভেতরে কেমন এক জলোচ্ছ্বাসের শব্দ পায় যেন। পড়তে শুরু করে সেই চিঠি :

এলাহী ভরসা

প্রিয় সোহেল,

পত্রে আমার দোয়া এবং ভালোবাসা নিও। আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছ। আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। পর সমাচার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই যে কোরবানীর ঈদের পর সেই যে এসে দেখা করে গেলে, তারপর ২ মাস পার হইল তোমার আর কোন খোঁজ পাইলাম না। কোন চিঠিও পাইলাম না। কেন পাইলাম না জানাইবা কি? আমার ফাঁসি তো এখনও হয় নাই। আমি তো মরে যাই নাই। এখনই আমাকে ভুলে গেলা? বুঝতে পারি ফাঁসির আসামী ভাইকে আর কে মনে রাখতে চায়। আমি কি অপরাধ করছি সেটা শুধু আমি জানি আর আল্লাহ জানে। তোমাকে আর কি বলব। আমার ফাঁসির দিন এখনও ধার্য হয় নাই। আমি তো সংসারের কোন কাজে লাগলাম না। মায়ের মনে শান্তি দিতে পারলাম না। তুমি এখন বড় হইছো তোমাকে আর কি বলবো। আমি যা পারি নাই তুমি তা করবা। মায়ের মনে কোন কষ্ট দিবা না। আমাদের বাবা যখন বেঁচে ছিলো তখনকার দিনগুলার কথা ভাবো। কি দিন ছিলো আমাদের। সেই বাস এ্যাক্সিডেন্ট আমাদের কাছ থেকে বাবাকে নিয়া গেলো। আমাদের জীবনটা অন্ধকার হয়ে গেলো। মায়ের পাশে এখন খালি তুমি আছ। আমি তো কুলাঙ্গার। একটা কথা বলি, যত বিপদেই পড়, রুহুল কাকার কাছে কোনদিন যাইও না। রুহুল কাকা মারে অনেক অপমান করছে। সোহেল, তুমি কি নেশাটা ছাড়ছো না এখনও করো। বড় ভাই হিসাবে তোমাকে বলতেছি নেশাটা ছেড়ে দাও। মা জীবনে অনেক কষ্ট করছে। তারে আর কষ্ট দিও না। কাদের মামা আমাদের পাশে আছে। তার কাছে পরামর্শ নিবা। সেলুনের চাকরীটা বেশীদিন কইর না। সেইখানে কোন উন্নতি নাই। মামার সাথে কথা বলো সে তোমাকে অন্য চাকরী যোগাড় করে দিতে পারবে। ফাঁসির সেলে থাকলেও সব খবর পাই। দেশের পরিস্থিতি ভালো না। কোন ঝামেলায় জড়াইও না সোহেল ফাঁসির সেলে শুইয়া যখন তোমার কথা, মায়ের কথা মনে পড়ে তখন পাগল হয়ে যাই। মারে বইলো আমার জন্য দোয়া করতে সংসারের জন্য কিছু করতে পারলাম না।

সোহেল ফাঁসির আগে তুমি আসবা কি না, তোমার সাথে আর দেখা হবে কি না জানি না। তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। আল্লার কসম লাগে দয়া করে এই অনুরোধটা রাইখ। তুমি একজনের সাথে দেখা কইর। ওয়ারলেসের দক্ষিন গেট দিয়া বরাবর গিয়া বাম দিকের চার নম্বর গলিতে ঢুকলে দেখবা 'শরিয়তপুর টেইলার্স' নামে একটা সেলাইয়ের দোকান আছে। সেখানে গিয়া খোঁজ করবা রীনা নামে একটা মেয়ে এখনও সেলাইয়ের কাজ করে কি না। যদি রীনা থাকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাইলে তাকে বাইরে ডেকে আনবা, আড়ালে নিয়া খালি বলবা 'আপনে শাহীনরে মাপ কইরা দিয়েন।' আর কিছু জিজ্ঞাস করার দরকার নাই, বলার দরকার নাই।

তোমার শরীলের যত্ন নিও।
তোমার হতভাগা বড় ভাই
শাহীন

চিঠিটা শেষ করে দীর্ঘক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে থাকে আন্দালীব। তাকিয়ে থাকে বেওয়ারিশ চিঠিটার দিকে। কিছুক্ষণ পর সে আরেকবার পড়ে ওই চিঠিটা। পড়তে পড়তে তার মাথায় ভেতরের খেয়াল পোকা নড়ে ওঠে তখন। আন্দালীব এবার একটা সিদ্ধান্ত নেয়। গন্তব্যচ্যুত, পরিত্যক্ত এই চিঠির প্রেরকের শেষ অনুরোধ রক্ষা করবে সে। আন্দালীব সিদ্ধান্ত নেয় সে শরীয়তপুর টেইলার্স খুঁজে বের করবে।

পরদিন অফিসে যায় না আন্দালীব। জানায় তার শরীর ভালো নেই। স্ত্রীকে বলে, 'বাইরে যাচ্ছি, মোবাইল বন্ধ থাকবে।'

আন্দালীব গাড়ি নেয় না। একটা সিএনজি নেয়। ওয়্যারলেসের দক্ষিণ গেটের কাছে এসে সিএনজি ছেড়ে দেয় সে। তারপর হাঁটতে শুরু করে। শহরের এই গরিব পাড়ায় কখনো ঢোকেনি আন্দালীব। চেনা শহরের অচেনা প্রান্তে হাঁটে সে। হাঁটতে হাঁটতে দক্ষিণ গেটের বাঁ দিকের চার নম্বর গলিতে ঢোকে আন্দালীব। কিছুদূর হাঁটতে সত্যিই দেখতে পায় 'শরীয়তপুর টেইলার্স'। তার হৃৎকম্প বাড়ে। ছোট এক টেইলারিং দোকান। চারদিকে ঝুলে আছে সস্তা কাপড়ের নানা রঙের সালোয়ার-কামিজ। দোকানের সামনের শোকেসটার কাছে যায় আন্দালীব। গলায় গজফিতা ঝুলিয়ে, মোটা একটা কাঁচি দিয়ে কমলা নীল ছাপা একটা কাপড় কাটছে মাঝবয়সী একজন লোক। ভেতরের ঘরে সেলাই মেশিনের শব্দ। আন্দালীব তাকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, ভাই, এখানে রীনা নামে কোনো মেয়ে কাজ করে?

কাঁচি হাতে লোক ভুরু কুঁচকে তাকায়, করে তো। কী ব্যাপার?

আন্দালীব, না, এমনি একটু দরকার আছে।

স্পষ্টতই আন্দালীবকে তার কাস্টমার শ্রেণির কেউ মনে হয় না টেইলর লোকটির। তবে এ নিয়ে বিশেষ ঘাঁটাবারও কোনো প্রবৃত্তি তার ভেতর দেখা যায় না। সে পেছন ফিরে ভেতরের ঘরে ডাকে—রীনা, এই রীনা।

মেশিন চলার শব্দ বন্ধ হয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আন্দালীব বাস্তবিক আশা করেনি এই পরিস্থিতির। নেহাত অন্ধকার ঘরে ঢিল ছুড়তে চেয়েছিল সে। তার খুব অপ্রস্তুত লাগে। ঠিক বুঝতে পারে না কীভাবে সে মোকাবিলা করবে এই পরিস্থিতি।

আন্দালীব দেখতে পায় প্রায়ান্ধকার পেছনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে একজন শ্যামলা তরুণী। তার চুল চূড়া করে মাথার ওপর বাঁধা। সে তার ওড়না দিয়ে গলার এবং চিবুকের ঘাম মুছতে মুছতে অবাক চোখে আন্দালীবের দিকে তাকায়। তার শ্রেণি সীমানার বাইরের এই তরুণীর অভিনব আটপৌরত্ব কেমন বিহ্বল করে তোলে আন্দালীবকে।

কোনো অঙ্ক নেই, কোনো ব্যাখ্যা নেই তবু আন্দালীবের চকিতে মনে হয় এ এমন এক তরুণী, যাকে দেখে কোনো তরুণের মনে হতে পারে এমন একটি মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে পড়া যেতে পারে নিরুদ্দেশে।

আন্দালীব নিজেকে সামলে বলে, আপনি একটু বাইরে আসবেন?

অসীম কৌতূহল আর অনেকটুকু ভীতি নিয়ে সেই মেয়ে বাইরে এসে রাস্তায় দাঁড়ায়। গজফিতা হাতের টেইলর একবার ঘুরে দেখে তাদের।

চিঠির নির্দেশমতো খানিকটা আড়ালে গিয়ে আন্দালীব তার অনভ্যস্ত অপ্রমিত ভাষায় চিঠি প্রেরকের ঠিক প্রস্তাবিত সেই বাক্যটাই মেয়েটাকে বলে, 'আপনে শাহীনরে মাপ কইরা দিয়েন।'

সেই মেয়ে আন্দালীবের দিকে তাকিয়ে থাকে বিমূঢ়, নির্বাক। আন্দালীব দেখে মুহূর্তে কোন অতল থেকে তার দুই চোখে ফুটে উঠছে অশ্রু। গুনে গুনে দুই ফোঁটা।

ওজোনস্তর ভেদ করে কোনো আদিম গ্লেসিয়ারের বরফে প্রথম সূর্যতাপ পড়বার পর তা কি এমনই একাধারে মৃদু এবং তীব্রভাবে গলতে শুরু করেছিল?

'আর কিছু জিজ্ঞাস করার দরকার নাই, বলার দরকার নাই।' নির্দেশ আছে চিঠিতে। সে নির্দেশ পালন করে আন্দালীব। একজন ফাঁসির আসামির শেষ ইচ্ছা পূরণ করে আন্দালীব ফিরতি পথ ধরে।

মেয়েটির চোখে তখন আদিম প্রাকৃতিক জলবিন্দু চন্দ্র-সূর্যের মতো জ্বলতে থাকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চিন্তাশীল প্রবীণ বানর

এক নারীর রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে পুরান ঢাকার জমজমাট, কৌতূহলোদ্দীপক জনপদের জনৈক যুবক বলে, 'চান্দের আলো হালায় মাইয়ার শরীলে ঢুইকা আর বারাইবার পারতাছে না।' পুরান ঢাকার জনতা ছাড়া জোছনা এবং নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে এমন আশ্চর্য বাক্য জগৎ-সংসারে কেউ রচনা করতে পারে না। আবার এই জনপদেরই জনৈক ক্ষুব্ধ বাকরখানি বিক্রেতা চিৎকার করে বলতে পারে, 'তোরে আমি টিকটিকি দিয়া চোদামু।' টিকিটিকির সঙ্গে মনুষ্য সংগমের এই অভূতপূর্ব জাদুদৃশ্য রচনাতেও পারঙ্গম এই এলাকার মানুষ। এই এলাকাতেই যুগপৎ গুঁড়া মসলার গন্ধ এবং ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলেমিশে থাকে। লেখক শহীদুল জহির এই এলাকার এক যুবকের গল্প শোনান যে শৈশবে দারিদ্র্যের কারণে বানরের দুধ খেয়ে বড় হয় এবং প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি চুরির সংঘবদ্ধ চক্রের সদস্য হয়ে ওঠে। মানুষের সাথে সাথে এই এলাকার নিয়মিত বাসিন্দা লম্বা লেজওয়ালা খয়েরি রঙের বানরদের ঘোর তৎপরতা দেখা যায়।

পুরান ঢাকার নারিন্দার পঞ্চাশ কামরার বিশাল বাড়ি 'পাঠান মঞ্জিল'-এর ছাদে, কার্নিশে কতিপয় বানর পরিবারের ঠিকানা। সেখানে একটা বিশেষ প্রবীণ বানর তার খয়েরি রঙের লেজ ঝুলিয়ে চিন্তাশীল ভঙ্গিতে বসে থাকে। অন্যান্য বানরের মতো যে চঞ্চল নয়। কার্নিশে বসে যে জগৎ-সংসারকে দেখে। হতে পারে সে মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি চোরের দুধমার বংশধর। সে পাঠান মঞ্জিলের দক্ষিণ প্রান্তের ঘর থেকে আবদুল মোমেনকে সন্ধ্যার পর মাগরিবের নামাজ পড়তে মসজিদে যেতে দেখে। আবদুল মোমেন একরকম পথের দিকে তাকিয়েই হাঁটেন। কদাচিৎ কারও সাথে কথা বলেন। লোকে তাঁকে দেখলে সালাম দেয়, 'আসসালামালাইকুম চাচা মিয়া, শরীল বালা তো?' মোমেন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়িয়ে মসজিদে ঢুকে যান। ইবাদত-বন্দেগি করেন। হাদিস-কোরআন পড়েন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রবীণ বানর মোমেনকে বিশেষভাবে দেখে। কারণ, সে জানে এই লোক এ মহল্লায় নতুন। আবদুল মোমেন পুরান ঢাকায় এসেছেন কলকাতার শহরতলি থেকে। কলকাতা থেকে আবদুল মোমেন ঠিক কেন ঢাকা এসেছেন, প্রবীণ বানর তা জানে না। মহল্লার মানুষও ঠিক জানে না তাঁর কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসার কারণ। এ নিয়ে তাদের বিশেষ ভাবনাও নেই। কারণ, এমন অনেককেই তারা এই মহল্লায় আসতে দেখেছে। তারা ধারণা করে, হয়তো তিনি কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের কোনো দাঙ্গার ভেতর পড়েছিলেন। এইটুকু জানে যে তাঁকে কলকাতা থেকে এখানে নিয়ে আসার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন আলী হায়দার। কথা সত্য, আবদুল মোমেনকে ঢাকা চলে আসবার ভাবনাটা সরবরাহ করেন আলী হায়দার, যিনি আবদুল মোমেনের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। ঢাকার একটি বিমা কোম্পানিতে কাজ করেন তিনি এবং থাকেন বাংলাবাজারে। আলী হায়দার কলকাতায় যাওয়া-আসা করতেন এবং তাঁদের ভেতর চিঠিপত্রের যোগাযোগও ছিল। কলকাতায় সংখ্যালঘু হয়ে থাকার চেয়ে ঢাকায় চলে আসার বিবিধ সুবিধার বয়ান আবদুল মোমেনকে দেন আলী হায়দারই। তারপর নানা ঘোরা পথে, ঘোরা প্রক্রিয়ায় আবদুল মোমেন সপরিবার চলে আসেন ঢাকায়। পাঠান মঞ্জিলে ওঠেন, আলী হায়দারের সহযোগিতায় বিমা কোম্পানিতে একটা চাকরিও জোগাড় করেন। একপর্যায়ে বাংলাদেশের পাসপোর্টও জোগাড় হয় তাঁর। প্রবীণ বানরের এত সব জানার কথা নয়। সে কেবল মহল্লার এই নতুন মুখের মৃদু হাঁটাচলা লক্ষ করে।

মহল্লায় এক আলী হায়দারের সঙ্গেই বস্তুত মোমেনের যোগাযোগ। আলী হায়দার ওয়ারী ফুটবল দলের সাপোর্টার। চাকরির বাইরে সেটিই তাঁর ধ্যানবিশ্ব। ওয়ারী মৃতপ্রায় দল। ফুটবলও লোকে তেমন দেখে না। তাতে আলী হায়দারের কিছু যায় আসে না। আলী হায়দার ওয়ারীর খেলা দেখেন এবং তাদের ফুটবল দক্ষতা বিষয়ে গবেষণা করেন দুই স্কুলপড়ুয়া ছেলে আর তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে সংসার আলী হায়দারের। ফরিদ নামে তাঁর স্ত্রীর গ্রামের এক দরিদ্র আত্মীয়ও থাকে তাঁর সাথে। পোলিও আক্রান্ত হয়ে এক পা পঙ্গু হয়ে যাওয়া ফরিদকে বাংলাবাজারে বই বাঁধাইয়ের কাজ দিয়েছেন হায়দার। মহল্লায় সে ল্যাংড়া ফরিদ নামে পরিচিতি। মোমেনের পরিবারের নানা ফুটফরমাশ খাটবার জন্য ফরিদকে পাঠান হায়দার মাঝে মাঝে।

প্রবীণ খয়েরি রঙের বানর পাঠান মঞ্জিলের শেষ কামরার জানালা দিয়ে মোমেনের স্ত্রী নিলুফার বেগম এবং মেয়ে টুম্পাকেও দেখে। আবদুল মোমেন মেয়েদের অবাধ চলাচলে বিশ্বাসী নন। কলকাতায় পর্দা, আকিদা চর্চার বিশেষ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুবিধা করতে না পারলেও ঢাকায় এসে তিনি কঠোর নিয়ম করেছেন যে নিলুফার পাঠান মঞ্জিলের বাইরে কোথাও যেতে পারবেন না। কলকাতার বাসে ট্রামে ঘুরে বেড়ানো নিলুফারের গতিবিধি ঢাকায় এসে সীমিত হয়ে পড়ে কেবল পাঠান মঞ্জিলের বিভিন্ন কামরা এবং ছাদে। ঢাকায় নিলুফারের কোনো আত্মীয়স্বজন নাই, চেনা পরিচিত নাই। তা ছাড়া তাঁর এক গোপন ভয়ও আছে। নিলুফার আশঙ্কা করেন, মোমেন তাঁকে ত্যাগও করতে পারেন। ফলে প্রতিবাদবিহীনভাবে তিনি তাঁর গতিবিধির সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েছেন। আবদুল মোমেন অফিসে গেলে নিলুফার পাঠান মঞ্জিলের কামরা থেকে কামরা ঘুরে বেড়ান। ছাদ থেকে যোগাযোগ স্থাপন করেন পাঠান মঞ্জিল ছাড়িয়ে অন্যান্য বাড়ির ছাদে।

কলকাতায় বেড়ে ওঠা নিলুফার পুরান ঢাকার প্রেক্ষাপটে এসে নানা বিভ্রাটের ভেতর পড়েন। তার একটি নিলুফারের ভাষা। পাশের বাড়ির মাহমুদা ছাদে কাপড় নাড়তে নাড়তে যখন নিলুফারকে জিজ্ঞাসা করে, আউজকা কী রানছেন আপা?

নিলুফার তখন বলে, এই ধরুন একটু সুক্তো রেঁধেছি আর তার সাথে টমেটোর সেলাদ। এ দিয়েই খাওয়া হবে আজগে।

মাহমুদা: আমরা তো সুক্তো খাই নাইক্কা কুনদিন। আমারে একদিন ছিখাইয়া দিয়েন আপা।

নিলুফার: নিশ্চয়। শিখিয়ে দেবখন।

আবদুল মোমেন কথা বিশেষ বলেন না বলে তাঁর বচন বিশেষ কারও নজরে আসে না কিন্তু নিলুফারের কলকাতাই বচন শাঁখের করাতের শব্দ আর খয়েরি রঙের বানরের প্রেক্ষাপটে বিচিত্র ব্যতিক্রম হিসেবে নারিন্দার বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। মহল্লায় বানরের সহাবস্থান বিষয়ে প্রবাসী নিলুফারের অনভ্যস্ততা এবং আনাড়িপনা দ্রুতই নজর কাড়ে প্রবীণ বানরের। সে প্রায়ই নিলুফারের রান্নাঘরে ঢুকে বিবিধ জিনিস নিয়ে চম্পট দেয়। নিলুফার থেকে থেকে বলেন, মরণ আমার।

প্রবীণ বানরের বিশেষ পছন্দ নিলুফারের বাড়ির কনডেন্সড মিল্ক। আবদুল মোমেন তিন চামচ কনডেন্সড মিল্ক দিয়ে কড়া মিষ্টি চা খেতে ভালোবাসেন। ফলে তাঁদের ঘরে সব সময় কনডেন্সড মিল্ক থাকে। প্রবীণ বানর একদিন রান্নাঘরের জানালার কার্নিশ থেকে সেই কনডেন্সড মিল্ক চুরি করে নিয়ে যাবার পর বিশেষভাবে সেই কনডেন্সড মিল্কের নেশায় পড়ে যায়। সে তার খয়েরি রঙের লেজ ঝুলিয়ে তক্কে তক্কে থাকে কখন কনডেন্সড মিল্কের কৌটাকে মালিকবিহীন পাওয়া যায়। কনডেন্সড মিল্কের কৌটা মিটসেফে রেখেও কাজ হয়নি। রাতের বেলা কৌশলে রান্নাঘরের জানালা খুলে মিটসেফ থেকে ওই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কৌটা চুরি করে নিয়ে গেছে প্রবীণ বানর। এরপর নিলুফার মিটসেফেও তালা লাগানোর ব্যবস্থা করেছেন।

প্রবীণ বানর রান্নাঘরের জানালা দিয়ে রন্ধনরত নিলুফারকে দেখে। ভেতরের ঘরে বেণি দুলিয়ে বছর ছয়-সাতের মেয়ে টুম্পাকে টেবিলে বসে পড়তে দেখে। বানর নিশ্চয়ই টের পায়, টুম্পার চেহারা পূজার সময় যে মূর্তিগুলো তৈরি হয় তার আদলের মতো। গোল, নিটোল, উজ্জ্বল।

মহল্লার বানর প্রজাতির সাথে বিশেষ জুতসই সম্পর্ক গড়ে না উঠলেও মহল্লার মহিলাদের সাথে বিশেষ করে সখ্য ভালোই গড়ে ওঠে নিলুফারের। আবদুল মোমেন প্রতিবেশীদের সাথে বিশেষ কথা না বললেও নিলুফার তাঁর ছাদ এবং নানা কামরা পদচারণের মাধ্যমে ভালোই যোগাযোগ স্থাপন করেছেন পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে। তিনি প্রতিবেশীদের কলকাতার গল্প করেন। গল্প করেন এসপ্লানেড, গড়ের মাঠ, বিড়লা প্লানেটোরিয়ামের।

সুলতানা জিজ্ঞাসা করে, কইলকাতার কফি হাউসের নাম সুনছি। গেছেন নিহি?

নিলুফার: কত গিয়েছি। কফি খেয়েছি, কাটলেট খেয়েছি। ওখানে ওয়েটাররা সব পাগড়ি পরে থাকে। বিখ্যাত লোকেরা সব কফি খেতে আসে সেখানে। ওখানে একবার আমি সৌমিত্রকে দেখেছি, ওই যে নায়ক।

সুলতানা হাচা নিহি?

নিলুফার পাঠান মঞ্জিলের ছাদ থেকে মহল্লার গতিবিধি লক্ষ রাখেন। জানতে পারেন কোথায় কী ঘটছে। নিলুফার ছাদে উঠলে দূর কার্নিশ থেকে প্রবীণ বানর বরাবর একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

নিলুফার মাহমুদাকে বলে: দেখেছেন আপা, এই বানরটা না কেবলই আমার দিকে ওমন ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকে।

মাহমুদা: আপনেরে বিয়া করবার চায় মনে লয়

হাসে দুইজন। মহল্লা নিয়ে গল্প জুড়ে দেয়।

নিলুফার: মাহমুদা আপা, ওই ৪২ নাম্বার বাড়ির মায়াকে পড়াতে আসে যে ছেলেটা, ওকে দেখি বাড়িতে ঢুকবার আগে গলির মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোজ একটা কলা কিনে খায়। মায়ার মা কি ছেলেটাকে নাশতা টাশতা কিছু খেতে দেয় না নিকি?

মাহমুদা: মায়ার মায়ে যে কিপটা, আমার মনে লয় খালি এক গেলাস পানি খিলাইয়া বিদায় করে।

সন্ধ্যায় মোমেন যখন মসজিদে থাকেন, তখন নিলুফার আকাশবাণী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কলকাতায় অনুরোধের আসরের গান শোনেন। সেটা রেডিওর যুগ। ঘরে ঘরে টিভি আসেনি তখনো। মিউজিক শুরু হলেই নিলুফার বলে দিতে পারেন, এটা শ্যামল মিত্রের 'এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে মন যেতে নাহি চায়' কিংবা হেমন্তের 'বনতল ফুলে ফুলে ঢাকা, দূর নীলিমায় ওঠে চাঁদ বাঁকা।'

তারপর একদিন মহল্লার লোকেরা বলতে থাকে, সুনছেন নিহি, মোমেন মিয়ার বউয়ের তো মিরকি ব্যারাম।

নিলুফারের মৃগীরোগের ব্যাপারটা প্রকাশিত হয়ে পড়ে যখন একদিন পাঠান মঞ্জিলের ছাদে তাঁর খিঁচুনি ওঠে। নিলুফারের দিকে বরাবর অপলক তাকিয়ে থাকা প্রবীণ বানর এ সময় নিলুফারকে এমন বিচিত্র ভঙ্গিতে মাটিতে শুয়ে কাঁপতে দেখে অস্বাভাবিক শব্দে ডাকতে থাকে। পাশের কামরার মাহমুদা বানরের এই অস্বাভাবিক ডাকে কৌতূহলী হয়ে ছাদে এসে নিলুফারকে খিঁচুনিরত দেখতে পায়। মাহমুদাই তারপর নিলুফারের নাকে এক পুরোনো চামড়ার স্যান্ডেলের গন্ধ শুঁকিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে।

নিলুফারের গোপন ভয় আর দুর্বলতার জায়গাটা এখানেই। মোমেনের সাথে যখন বিয়ে হয়, তখন নিলুফারের বাবা-মা তাঁর মৃগীরোগের ব্যাপারটা গোপন করেছিলেন। জানাজানি হয়ে যাবার পর মোমেন তাঁকে তালাক দেবার কথা বলেছেন বার কয়েক। দেননি। কিছুটা তাঁর ধর্মীয় কর্তব্যবোধে, অনেকটা কলকাতার সংখ্যালঘু মুসলমান জনপদে বিবাহযোগ্য মেয়ে পাবার সীমিত সম্ভাব্যতা ইত্যাদি বিবেচনা করে। তবে নিলুফারের ভয় ঢাকায় তো মোমেনের জন্য পাত্রী পাওয়া দুরূহ কিছু হবে না। ফলে এই মৃগীরোগের অভিযোগে তিনি তাঁকে ত্যাগও করতে পারেন মোমেন ও নিলুফারের সম্পর্ক নেহাতই আনুষ্ঠানিক। প্রয়োজনীয় সাংসারিক কথাবার্তার ভেতরই সীমিত থাকে তাঁদের যোগাযোগ।

মোমেন, নিলুফার, টুম্পা ক্রমশ প্রবীণ বানরের চোখের অভ্যস্ত অবয়বে পরিণত হয়ে ওঠেন। তবু সকল লোকের ভেতর থেকে তাঁদের দিকে তার বিশেষ নজর থাকে। নিলুফারও ক্রমশ বানর প্রজাতির সাথে সমঝোতায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। প্রবীণ বানর মোমেনকে ক্রমশ আরও সাবলীলতার সাথে মহল্লায় হাঁটাচলা করতে দেখে। যদিও তাঁর গতিবিধি অফিস এবং মসজিদ পর্যন্তই সীমিত। ইংরাজি ভালো জানেন বলে ইতিমধ্যে অফিসে মোমেনের প্রমোশন হয়। ক্রমশ টুম্পা আরও নিটোল আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বড় হয়ে যাওয়াতে নিলুফারের মতো টুম্পারও গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন মোমেন। স্কুল থেকে তাকে সোজা চলে আসতে হয় পাঠান মঞ্জিলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তবে একটা ব্যাপারে তাঁরা টুম্পাকে বিশেষ নিয়মে বাঁধতে পারেননি। ইতিমধ্যে নিলুফার ও মোমেন লক্ষ করেন, তাঁদের অজান্তেই টুম্পা কখন মুখে তুলে নিয়েছে পুরান ঢাকার কথ্য বচন। হয়তো তার স্কুলের বান্ধবীদের কাছ থেকেই। প্রাথমিকভাবে বাধা দিলেও একপর্যায়ে তাঁরা আর বিশেষ বাধা দেন না। টুম্পার মুখে ঢাকাই বচন শুনে তাঁরা একরকম কৌতুকই বোধ করেন। এ ছাড়া মনে মনে এ-ও ভাবেন যে মহল্লার মানুষের সাথে তাঁদের যে ভাষাগত দূরত্ব আছে সেটা যদি টুম্পা ঘুচিয়ে দিতে পারে, তবে আখেরে তা বস্তুত ভালোই। আবদুল মোমেন উপভোগই করেন যখন টুম্পা তাঁকে বলে, 'আব্বা, আপনেরে যে লাল মিয়ার দুকান থিকা সন্দেশ আনবার কইছিলাম আনেন নাই ক্যালা?'

এ সময় এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটে। যে বিমা কোম্পানিতে আবদুল মোমেন চাকরি করেন, সেখান থেকে তাঁকে দুই সপ্তাহের জন্য একটা প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয় আমেরিকার বোস্টন শহরে। এই সংবাদে মহল্লায় বেশ একটা সাড়া পড়ে। তখন মহল্লা থেকে এমন বিদেশ ভ্রমণের ব্যাপার বিশেষ ঘটেনি। স্বল্পবাক আবদুল মোমেনের ব্যাপারে লোকের কৌতূহল দেখা দেয়।

রাস্তায় থামিয়ে তাঁকে মহল্লার লোক জিজ্ঞাসা করে, আপনে বলে আমেরিকা যাইবার লাগছেন?

আবদুল মোমেন বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখান না। শুধু বলেন, জি।

টুম্পা বলে, আব্বা, আপনে আমার লিগ্যা বিদেশি পুতুল আইনেন।

নিলুফার বিশেষ উচ্চবাচ্য করেন না। মোমেন নিলুফারকে বলেন, সাবধানে থেকো।

কিন্তু আমেরিকা যাবার পর দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও আবদুল মোমেন আমেরিকা থেকে ফেরেন না। দুই সপ্তাহ পেরিয়ে তিন সপ্তাহ, এক মাস পেরিয়ে যায়। মোমেন ফেরেন না। নিলুফার বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন তাঁদের পারিবারিক বন্ধু হায়দারও। নিলুফারের যেহেতু পাঠান মঞ্জিলের বাইরের জগতের ব্যাপারে কোনো ধারণা নেই, তিনি নির্ভর করেন আলী হায়দারের ওপর। আলী হায়দার ভিন্ন এক বিমা কোম্পানিতে চাকরি করেন, তিনি আবদুল মোমেনের অফিসে গিয়ে খোঁজখবর করেন। আবদুল মোমেনের দেশে না ফেরা নিয়ে তাঁর অফিসও বিভ্রান্ত। তাঁরা জানান, মোমেনের ফিরতি টিকিট কাটা ছিল। তবু সেই ফ্লাইটে তিনি আসেননি। আমেরিকায় যেখানে তিনি প্রশিক্ষণে গিয়েছিলেন, তাঁদের সাথে যোগাযোগ করে তাঁর অফিস। তারাও জানায়, আবদুল মোমেন যথারীতি দুই সপ্তাহ প্রশিক্ষণ করেছেন কিন্তু তারপর কোথায় গেছেন তারা বলতে পারে না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আলী হায়দার নিলুফারকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনাকে কিছু বলে টলে নাই ভাবি?

নিলুফার : না তো, ঘুণাক্ষরেও কিছু বলেনি তো। কী হলো বলুন তো হায়দার ভাই?

হায়দার : আমিও তো ভেবে কিছু পাচ্ছি না। দেখি, আরও কয়টা দিন দেখি।

জানালা দিয়ে প্রবীণ বানর দেখে, নিলুফার এবং টুম্পা একে অন্যের সাথে আবদুল মোমেন বিষয়ে আলাপ করছে। সে-ও নিত্যদিন মসজিদের পথে হেঁটে যাওয়া আবদুল মোমেনকে দেখতে না পেয়ে ব্যাপারটা বুঝতে ছাদের কার্নিশে লেজ ঝুলিয়ে বসে চিন্তা করে।

মহল্লার লোকেরা কৌতূহলী হয়ে ওঠে, বলে, 'মোমেন মিয়ার হইচে কী? অক্করে যে লা পাত্তা হইয়া গেল।'

নিলুফারের হাতে সঞ্চয় ফুরিয়ে আসে। আলী হায়দারের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নেন তিনি। আলী হায়দার নিলুফারের বাজারঘাটও করে দিয়ে যান।

দেড় মাসের মাথায় আবদুল মোমেনের চিঠি আসে। মোমেন জানান, তিনি প্রশিক্ষণ শেষ হবার পর এয়ারপোর্টে যাবার পথে হঠাৎ ট্যাক্সি থেকে নেমে সিদ্ধান্ত নেন আমেরিকাতে থেকে যাবেন। জানিয়েছেন তিনি এখন বোস্টনেই আছেন। একটা গ্রোসারি দোকানে এক বাংলাদেশি তাঁকে কাজ দিয়েছেন। তিনি থাকারও ব্যবস্থা করেছেন। মোমেন বলেন, তিনি এখানে থেকে যাবেন এবং একদিন নিলুফার ও টুম্পাকেও নিয়ে আসবেন। কাগজপত্র হতে তাঁর কিছু সময় লাগবে। তবে টাকাপয়সার সমস্যা হবে না। তিনি কাজ করে যা কামাই করছেন, তাতে নিজের খরচ চালিয়ে ঢাকাতেও পাঠাতে পারবেন। জানান, টাকা তিনি হায়দারের নামেই পাঠাবেন। হায়দার তা পৌঁছে দিয়ে আসবেন নিলুফারকে। মোমেন নিলুফারকে আল্লাহকে স্মরণ করতে বলেন সব সময়। পাঠান মঞ্জিলের বাইরে যেতে মানা করেন। বলেন, আল্লাহ সব দেখছেন।

নিলুফার ও হায়দার মোমেনের এই বিচিত্র সিদ্ধান্তে বিস্মিত হয়। কী প্রতিক্রিয়া জানাবেন বুঝতে পারেন না। মহল্লার লোকেরা বলে, মোমেন মিয়া বিদ্যাশ গিয়া কোন চক্করে পড়ল?

মোমেন ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নে টাকা পাঠান হায়দারের নামে। সে টাকা তুলে নিয়মিত নিলুফারকে দিয়ে যান তিনি। নিলুফারকে বাজারঘাট, ঘরের নানা কাজের জন্য হায়দার প্রায়ই পাঠিয়ে দেন পঙ্গু ফরিদকে।

নিলুফার মোমেনের কথা রাখেন। মোমেনের অনুপস্থিতিতে পাঠান মঞ্জিলের বাইরে যান না। তা ছাড়া কথা না রেখেও উপায় নাই বিশেষ, কারণ,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনভ্যস্ততায় এই দালানের বাইরে যাবার সাহসও তাঁর মনে কখনো জাগে না। টুম্পাও স্কুল শেষে সোজা চলে আসে বাসায়। মোমেনের আমেরিকা থেকে যাবার সিদ্ধান্তে নিলুফারের প্রাথমিক বিচলিত হবার ভাবটা ক্রমশ চলে যায়। একধরনের নির্বিকারত্ব দেখা দেয় তাঁর ভেতর। একটা খুদে জনপদের মতো পঞ্চাশ কামরার সেই বাড়ির এক কোনায় নিলুফার তাঁর কন্যাকে নিয়ে দিন যাপন করতে থাকেন। বরাবরের মতো সুক্তো রান্না করেন, মাহমুদার সাথে গল্প করেন। আরেক বারান্দায় নিরঞ্জন বাবুকে ধ্যান করতে দেখেন। রেডিওতে অনুরোধের আসরে মান্না দের গান শোনেন, 'ও রুপের মিথ্যে গরব ওমন যদি বিরূপ থাকে, ও গুণের কী দাম বলো লাজে যদি আগুন ঢাকে।' মাঝে আরও কয়েকবার মৃগীর আক্রমণ ঘটে তাঁর। মহল্লার ডাক্তার হাকিম চিকিৎসা করেন তাঁর। প্রবীণ বানর তার খয়েরি লেজ ঝুলিয়ে চিন্তাশীলভাবে নিলুফার ও টুম্পার দিকে নজর রাখে।

মাহমুদা বলে, আপা, টুম্পার বাপে ওই দ্যাশে গিয়া সাদি উদি কইরা ফালায় নাই তো।

নিলুফার, ও মরুগ গে, চুলোয় যাক। আমি কী জানি!

এক বছর যায়, দুই বছর যায়, যায় তিন বছর। আবদুল মোমেনের আর কোনো খোঁজ নাই। মাঝে মাঝে হায়দারের কাছে চিঠি আসে, তাতে কাগজপত্র হয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি। পাঠান মঞ্জিলের লোকেরা বারান্দার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের শেষ কামরার নিলুফার ও টুম্পাকে নিয়ে কথা বলে।

তারপর একদিন ঘটনার মোড় ঘোরে।

পাঠান মঞ্জিলের যে কামরায় নিলুফার আর টুম্পা থাকে, সেখানে একদিন বাথরুমে পানি নেই। টুম্পা নিচের কলতলা থেকে বালতিতে পানি দোতলায় তুলবার চেষ্টা করে। এ সময় হঠাৎ সে পা পিছলে পড়ে যায় সিঁড়িতে। মুহূর্তে সিঁড়ি ভেসে যায় রক্তে। ছাদ থেকে এই দৃশ্য দেখে প্রবীণ বানর আবার অস্বাভাবিক শব্দ করতে থাকে। আবার ছুটে আসে মাহমুদা দেখা যায় টুম্পার শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নাই কিন্তু তার পায়জামা ভিজে গেছে রক্তে। টুম্পার মাকে ডাকে মাহমুদা। টুম্পাকে ধরাধরি করে ঘরে নেওয়া হয়। ডাক্তার হাকিম এসে টুম্পাকে দেখেন। একটা পরীক্ষা দেন। সন্ধ্যায় পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে আসেন তিনি। এসে জানান, টুম্পার গর্ভপাত হয়েছে।

নিলুফারের চোখ স্থির হয়। শক্ত হয় চোয়াল।

জানতে পেরে মাহমুদা বিস্মিত হয়ে বলে, কয় কী?

অবিবাহিত কিশোরী টুম্পার গর্ভবতী হয়ে যাওয়ার ব্যাপার মহল্লায় আলোচিত হতে থাকে। পুরুষ সদস্যহীন পাঠান মঞ্জিলের দক্ষিণ প্রান্তের এই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কামরার ব্যাপারে কৌতূহল বেশ কিছুকাল জারি আছে মহল্লায়। এ ঘটনায় ব্যাপারটা সুরাহা করবার বিষয়ে মহল্লার মুরব্বিরা নৈতিক দায়িত্ব বোধ করেন। সত্য উদ্‌ঘাটনে ডাক্তার হাকিমের অবস্থান সুবিধাজনক বলে তাঁকে এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে বলেন মুরব্বিরা। ডাক্তার হাকিম তাঁর চিকিৎসক অবস্থানের সুবাদে টুম্পার সাথে বিশেষ আলাপের সুযোগ গ্রহণ করেন এবং সত্য উদ্‌ঘাটনে সফল হন। টুম্পা স্বীকার করে তার গর্ভধারণের জন্য দায়ী ল্যাংড়া ফরিদ।

ঘটনা পাঠান মঞ্জিলের মুরব্বিদের ক্ষিপ্ত করে। এ ধরনের নৈতিক অধঃপতনের একটা বিচার হওয়া জরুরি মনে করেন তাঁরা। এদের দুজনের ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার বলেও তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত হয় টুম্পা ও ল্যাংড়া ফরিদকে নিয়ে সালিস হবে এবং সেখানেই সিদ্ধান্ত হবে এদের দুজনের ব্যাপারে।

ইতিমধ্যে ডাক্তার হাকিম চিকিৎসা চালিয়ে যান। টুম্পার বিছানার পাশে বসে নিলুফারকে ডাক্তার জানান টুম্পা ও ল্যাংড়া ফরিদকে নিয়ে মহল্লার মুরব্বিরা একটা সালিস বসাবেন অচিরেই।

নিলুফার নীরব থাকেন কিছুক্ষণ, তারপর বলেন, বসুন, আপনাকে এক কাপ চা দিই।

বলে তিনি চলে যান রান্নাঘরে।

নিলুফার রান্নাঘরে চলে গেলে কাঁথায় শরীর ঢেকে শুয়ে থাকা টুম্পা খোলা জানালা দিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে যা বলে, তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না ডাক্তার হাকিম।

টুম্পা বলে, আপনারা যেই কামের লিগা আমার নামে বিচার বহাইছেন, ওই কাম তো আগে করছে আমার মায়ে। আগে ফরিদ আর আমার মায়ের বিচার করেন, হের বাদে আমার বিচার করবার আইয়েন।

এ সময় দেখা যায় জানালায় মুখ বাড়িয়ে চিন্তাশীল ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে প্রবীণ সেই খয়েরি বানর।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীতে হয়তো বৃহস্পতিবার

যেন একটা মঞ্চ। আলো ক্রমে কমে আসে চারিদিকে। ঘিরে ঘিরে আসে মেঘ। যেন এরপর নাটকের সবচেয়ে ক্লাইমেক্স দৃশ্যটা অভিনীত হবে। হঠাৎ বজ্রপাত শুরু হয়। অদ্ভুত বজ্রপাত একের পর এক। বেশ কিছু সময়ের ব্যবধানে একটার পর একটা। থামে না। কোথাও কোনো গ্যালাক্সিতে মহাযুদ্ধ বেধেছে বুঝিবা। আধো অন্ধকার হয়ে আসা ফুটপাত ধরে হাঁটে মাসুদ। সে নিরালম্ব বোধ করছে। এ সময় তার মোবাইল বেজে ওঠে। রুমার ফোন।

'তুমি কই?' রুমা জিজ্ঞাসা করে।

'ফুটপাতে হাঁটতেছি।' বলে মাসুদ।

তারপর রুমা কিছু একটা বলে। কিন্তু তখনই বিকট শব্দে আরেকটা বজ্রপাত হওয়াতে কিছু শুনতে পায় না মাসুদ।

কী বললা?—মাসুদ।

শুনো, তুমি একটা কোনো শেডের নিচে যেয়ে দাঁড়াও—রুমা।

কেন কী হইছে?—মাসুদ।

দেখতেছ না কী রকম বজ্রপাত হচ্ছে? ফুটপাতে না হেঁটে একটা কোনো শেডের নিচে যেয়ে দাঁড়াও—রুমা

রুমার কণ্ঠস্বর শুনে মাসুদের মনে হলো, উজ্জ্বল হলুদ পা নিয়ে একটা শালিক পাখি আলতো করে তার ভারী হয়ে ওঠা বুকের ওপর বসল। কিছুক্ষণ নীরব থেবে মাসুদ বলে, আচ্ছা, আচ্ছা দেখি। তুমি ফোন রাখো।

এ সময় ঝুম ধরে বৃষ্টি নামে। অঝোরধারায় বৃষ্টি। মাসুদ দৌড়ে টিনের ঝাঁপি দেওয়া একটা পান সিগারেটের দোকানে গিয়ে দাঁড়ায়। তুমুল বৃষ্টি নামে। রাস্তার গাড়ির গতি কমে আসে। লোকজন নানা দিকে ছোটাছুটি করে বিভিন্ন আশ্রয়ে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর সবাই কেমন যেন ধ্যানস্থ হয়ে পড়ে। ক্রমশ সবাই যেন কেমন অন্য গ্রহের বাসিন্দা হয়ে যায়। মঞ্চের সব অভিনেতা-অভিনেত্রী অঝোর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টি দেখতে দেখতে কী যেন ভাবে। মাসুদও ভাবতে থাকে। ভাবে রুমার শেষ কথা, 'শেডের নিচে যেয়ে দাঁড়াও।' কী বোঝাতে চায় রুমা?

ফ্রাঙ্ক সিনাত্রার গানটা মনে পড়ে তার, 'ফ্লাই মি টু দ্য মুন...আমাকে চাঁদে নিয়ে যাও। আমি তারার সঙ্গে খেলি। দেখি মঙ্গল গ্রহে কী করে বসন্ত আসে...ইন আদার ওয়ার্ডস আই লাভ ইউ।' রুমার কণ্ঠ বুকে বাজে তার 'শেডের নিচে দাঁড়াও...ইন আদার ওয়ার্ডস আই লাভ ইউ।'

মাসুদের মনে হয় ভাগ্যিস পৃথিবীতে রুমার মতো মেয়েরা জন্মেছিল।

বৃষ্টি থামে না।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এক ছেলে পান দোকানদারকে এসে বলে, 'ওস্তাদ, এই এক শ টাকার নোটটা বদলাইয়া দেন, ছিঁড়া, কেউ নেয় না।'

পান দোকানদার রেগে তার দিকে তাকিয়ে বলে, এই ছিঁড়া টাকা যদি চালাইতে না পারস, তোর ঢাকা শহরের ভিসা বাতিল।

আবার একটা বজ্রপাত হয়। বৃষ্টি থামে না।

মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ধ্যানমগ্ন। একটা কুকুর পান দোকানের টিনের ঝাঁপির নিচে এসে জোরে শরীর থেকে পানি ঝাড়ে। সে পানি মাসুদের গায়ে এসে লাগে। দোকানদার চেঁচিয়ে ওঠে, এই শালা কুত্তারে তাড়া।

একটা খুব দমকা হাওয়া বয়। হাওয়ায় কে যেন বলে যায়, প্রতারণার দক্ষতাই এই শহরে টিকে থাকার মন্ত্র।

রাস্তায় রিকশার সারি। সব রিকশার সামনে পর্দা। পর্দার আড়ালে আলো-অন্ধকারে দেখা যায় যাত্রীদের মুখ। গত বৃহস্পতিবারও ঠিক এমন তুমুল বৃষ্টি হচ্ছিল। সেদিনই রিকশার পর্দায় লাল কবুতরের ছবির কথাটা মাসুদ বলেছিল কায়সার ভাইকে।

কায়সার হক কোম্পানির কমিউনিকেশন ডিভিশনের দায়িত্বে। তাঁর অধীনেই কাজ করে মাসুদ। অফিসে কিছুকাল ধরে খানিকটা কোণঠাসা হয়ে আছেন কায়সার হক। মার্কেটিং ডিভিশনের হেড হিসেবে সম্প্রতি জয়েন করেছেন আকরাম আলী। তিনি কায়সারকে বিশেষ পছন্দ করেন না। কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার শহীদুল ইসলামকে আকরাম আলী প্রায়ই বলেন, কমিউনিকেশন ডিভিশনে নিউ ব্লাড দরকার, কায়সার হকের কোনো ইনোভেটিভ আইডিয়া নাই।

মাসুদ কায়সারের অনেক জুনিয়ার কলিগ তবু কায়সার প্রায়ই তার সাথে বসে আড্ডা দেয়। অফিস ছুটির পর কায়সার প্রায়ই মাসুদকে বলে, চলো, একটু চা খাই। অফিসের ক্যানটিনের বদলে তারা গিয়ে বসে রাস্তার ওপারে একটা ছোট চায়ের দোকানে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গত বৃহস্পতিবার ছুটির পর ওই চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছিল কায়সার আর মাসুদ।

মাসুদ বলে, কায়সার ভাই, বৃহস্পতিবার নিয়ে বিনয় মজুমদারের একটা কবিতা পড়লাম, আপনাকে শোনাই।

কায়সার : বৃহস্পতিবার নিয়ে কবিতা? সেইটা কী রকম?

মাসুদ : শুনাই আপনাকে।

মাসুদ আবৃত্তি করে

আজ বৃহস্পতিবার : পৃথিবীতে হয়তো বৃহস্পতিবার নয়
মাঠে মাঠে ছাগল ঘাস খাচ্ছে, তাদের পিঠে লাগছে
মহাজগতের রোদ। আমারও ঘুমানোর সময়
হয়ে এলো। কিন্তু একদা ভুট্টা চন্দ্রসিক্ত হয়েছিলো
এই স্মৃতি মনে করে আমি ঘুমাতে পারি না
বসে বসে ম্যাচ বাক্সের কাঠি গুনি।

কায়সার : কবিতার মাথামুণ্ডু তো কিছু বুঝলাম না।

মাসুদ : বেশি বুঝার দরকার নাই কায়সার ভাই। এই ধরেন একটা লোক দুপুরে ঘুমানোর চেষ্টা করছে। বাইরে মাঠে কতগুলো ছাগল ঘাস খাচ্ছে, সেই ছাগলের গায়ে এসে রোদ পড়েছে। রোদটা তো ধরেন আসছে বহুদূর থেকে। সূর্য থেকে। সূর্য তো মহাজগতের একটা ব্যাপার। ধরেন সেই লোকটা কোনো একটা গ্রামের বাড়িতে বসে রোদের মতো একটা মামুলি ব্যাপার দেখছে। কিন্তু ব্যাপারটা তো মামুলি না। একটা মহাজাগতিক ব্যাপার। তো সেই ছোট্ট গ্রামে বসে তার মহাজাগতিক একটা ব্যাপারের অভিজ্ঞতা হচ্ছে। রোদের মতো একটা মহাজাগতিক ব্যাপার নিয়ে ভাবতে ভাবতে তার চাঁদের আলোর মতো আরেকটা মহাজাগতিক ব্যাপারের কথা মনে আসে তার এই লোক কোনো এক রাতে ভুট্টাখেতে ভুট্টার গায়ে চাঁদের আলো এসে পড়তে দেখেছে সেটা নিশ্চয়ই বেশ একটা অপূর্ব দৃশ্য। সেই অপূর্ব দৃশ্যের স্মৃতি মনে করে তখন তার ঘুম আসছে না। কী করবে সে ঠিক বুঝতে পারছে না। একটু আগে সিগারেট খেয়ে ম্যাচবাক্সটা তার টেবিলের ওপর রেখেছিল। সেটা থেকে ম্যাচের কাঠিগুলো বের করে সে গুনতে শুরু করে। একটা কাজ পায় যেন সে। কোনো এক বৃহস্পতিবার ঘটনাটা ঘটে। ছাগল, ভুট্টা, ম্যাচবাক্সের একটা অদ্ভুত জাকস্টাপজিশন আছে এখানে। কবিতাটা বোঝার দরকার নাই কায়সার ভাই। একজন নিঃসঙ্গ লোক বসে বসে ম্যাচের কাঠি গুনছে শুধু এই দৃশ্যটা ভাবেন তাহলেই হবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কায়সার : তুমি তো আমার মাথা আউলাইয়া দিতেছ মাসুদ। তোমার মাথার ভিতরে তো আইডিয়া গিজগিজ করে কিন্তু সেগুলি তুমি ঠিকমতো চ্যানেলাইজ করো না। ডিসট্রাকটেড থাকো। ফোকাসড হইতে হবে তো।

মাসুদ : ফোকাসড তো হতে চাই কায়সার ভাই, কিন্তু মন খালি এদিক-ওদিক ছুটে?

কায়সার : এদিক-ওদিক ছুটলে তো হবে না। এলার্ট থাকতে হবে। দেখতেছ না মার্কেটিয়ের ঐ আকরাম আলী আইসা কী শুরু করছে? অফিসের পরিবেশটারে টক্সিক কইরা তুলতেছে। আমারে থ্রেট করে।

মাসুদ : তাকে তো খরগোশের মতো অ্যালার্ট লাগে। কান সব সময় খাড়া। কখন কোন দিকে ছুটতে হবে জানে।

কায়সার : সে আমারে কনুই মারার তালে আছে। বসকে নানাভাবে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করতেছে।

মাসুদ : কায়সার ভাই আমি তো এখনো প্রভিশনাল পিরিয়ডে। আমার চাকরির কনফার্মেশনের ব্যাপারটা একটু খেয়াল রেখেন।

কায়সার : আরে মিয়া, আমারই এখন সারভাইভালের প্রশ্ন। বসরে ইমপ্রেস করতে না পারলে আমারই চাকরি থাকে না। তবে তোমার কথা মাথায় আছে আমার।

তারা বেরোতে যাবে, সে সময় হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়। আরেক কাপ চা নেয় মাসুদ আর কায়সার। বাইরে ঝুম বৃষ্টি হতে থাকে। রাস্তায় রিকশার ভিড়। রিকশার সব যাত্রী বরাবরের মতো একটা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে বৃষ্টি ঠেকিয়ে রেখেছে। কোনো কোনো রিকশায় দড়ি দিয়ে পর্দাটা টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো রিকশায় যাত্রী নিজেই পর্দাটা দুহাত দিয়ে ধরে রেখেছে। বরাবরের মতো বাইরে থেকে আধো অন্ধকারে শুধু দেখা যাচ্ছে যাত্রীদের মাথা অথবা চোখ। বৃষ্টি অঝোরধারায় পর্দার ওপর পড়ছে তারপর সরু ধারা হয়ে নামছে। মাসুদ আর কায়সার হক চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বৃষ্টি দেখে।

মাসুদ হঠাৎ বলে : কায়সার ভাই, একটা আইডিয়া আসছে।

কায়সার : কী আইডিয়া?

মাসুদ আচ্ছা, আমরা রিকশার এই পর্দাগুলিকে কমিউনিকেশন ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহার করি না কেন?

কায়সার : কী রকম?

মাসুদ : এই যে দেখেন, সারি সারি রিকশার প্রত্যেকটার সামনে একটা পর্দা। পর্দাগুলি এমটি। ধরেন রিকশার এই পর্দাগুলি কিন্তু হতে পারে এক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটা বিলবোর্ড বা ক্যানভাস। আমাদের কোম্পানির লোগো দিয়ে আমরা স্পেশাল রিকশার পর্দা বানাব। তারপর ঢাকা শহরের সব রিকশাওয়ালাকে সেগুলো সাপ্লাই করব।

কায়সার : ব্যাপারটা আরেকটু এলাবোরেট করো তো।

মাসুদ : মানে ধরেন আমরা সব রিকশাওয়ালাকে আমাদের কোম্পানির লোগো এই লাল কবুতর ইমপ্রিন্ট করা প্লাস্টিকের পর্দাগুলো ফ্রি ডিস্ট্রিবিউট করলাম। ধরেন সাদা পর্দায় লাল কবুতরের লোগো। এখন তো প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টি হচ্ছে। আর বৃষ্টি হলেই সব যাত্রী ওই পর্দা খুলবে। সারা শহরের রিকশায় রিকশায় হঠাৎ ফুটে উঠবে লাল কবুতর। আমাদের প্রোডাক্টের কোনো ইমেজ দেওয়ার দরকার নাই, শুধু ওই লাল কবুতরটা থাকবে। সারা শহরের বড় রাস্তায়, ছোট রাস্তায়, অলিতে-গলিতে দেখা যাবে লাল কবুতরের মিছিল। যারা আমাদের লোগো চেনে তাদের ভেতর এই ইমেজের একটা ইমপ্যাক্ট হবে আর যারা চেনে না তাদের কিউরিওসিটি হবে।

কায়সার চুপ করে শোনে। শুধু বলে, হুম্।

মাসুদ বলতে থাকে, ব্যানার বলেন, বিলবোর্ড বলেন, পোস্টার বলেন, রিকশার পর্দাই সে পারপাজটা সার্ভ করবে। এর জন্য বাড়তি কোনো ঝামেলা নাই। সিম্পল আইডিয়া, সিম্পলভাবে এক্সিকিউট করা যাবে।

কায়সার : খারাপ বলো নাই। ঠিক আছে এখন চলো, বৃষ্টি থামছে, বাড়ি ফিরি।

বৃহস্পতিবার, সপ্তাহের শেষ দিনে কায়সার ভাইয়ের সাথে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফেরে মাসুদ। তিন বন্ধু মিলে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে তারা। একেকজন একেক অফিসে কাজ করে। কয়েক গলি পরেই রুমাদের বাড়ি। আড্ডা দেবার জন্য মাসুদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসে রুমা। শুক্রবার, শনিবার কোথাও বের হয় না মাসুদ। রুমার সঙ্গেও দেখা হয় না। ল্যাপটপে 'ব্রেকিং ব্যাড' টিভি সিরিয়ালের সব কটা এপিসোড ডাউনলোড করে দেখে। ছুটি কাটিয়ে রোববার অফিসে গেলে মাসুদ জানতে পারে বিকেলে ছুটির আগে তাদের কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার একটা স্পেশাল মিটিং ডেকেছেন।

বিকেলে মিটিংয়ে যায় মাসুদ। জেনারেল ম্যানেজার শহীদুল ইসলাম বললেন, আপনাদের ডাকলাম একটা বিশেষ কারণে। উইকএন্ডে কায়সার আমাকে ফোন করে বলল, তার একটা মার্কেটিং আইডিয়া আছে সেটা সবার সাথে শেয়ার করতে চায়। আমাদের ওপিনিয়ন চায়। শহীদুল ইসলাম বলেন, কায়সার ফ্লোর ইজ ইয়োর্স।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কায়সার টেবিলের সামনে গিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট খোলে, বলে—আমার আইডিয়াটা খুব সিম্পল। একটা ছোট্ট ভিজ্যুয়াল ক্লিপ দেখাচ্ছি আপনাদের। ভেরি শর্ট। ফোর্টি সেকেন্ডের একটা ক্লিপ।

স্ক্রিনে একটা অ্যানিমেশন দেখা যায়। রাস্তায় শত শত রিকশা। বৃষ্টি হচ্ছে। রিকশার সামনে পর্দা। সেই পর্দায় তাদের কোম্পানির লোগো লাল কবুতর। রিকশাগুলো এগিয়ে যাচ্ছে।

কায়সার—ইট ইজ এজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। এই হচ্ছে আমার আইডিয়া। আমরা রিকশার পর্দাগুলিকে বিলবোর্ডে ট্রান্সফর্ম করব।

হঠাৎ মাসুদের নিশ্বাস দ্রুত হতে থাকে। কেমন যেন ঝিম ধরে মাথায়। সে বার কয়েক চোখের পাতা বন্ধ করে আবার খোলে।

জেনারেল ম্যানেজার শহীদুল ইসলাম বলে ওঠেন, ইটস আ ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া কায়সার। দারুণ ইনোভেটিভ থিংকিং। আমার তো খুব পছন্দ হয়েছে। হোয়াট ডু ইউ অল থিঙ্ক, বলে তিনি অন্য কলিগদের দিকে তাকান।

হিউম্যান রিসোর্সের মঞ্জুরুল হক বলে ওঠেন, এটা তো স্যার ফাটাফাটি আইডিয়া। রীতিমতো সেনসেশন তৈরি করবে।

শহিদুল ইসলাম মার্কেটিং হেডের দিকে তাকিয়ে বলেন, হোয়াট ডু ইউ থিংক আকরাম?

কায়সার তীক্ষ্ণ চোখে আকরাম আলীর মন্তব্যের জন্য অপেক্ষা করে।

আকরামকে একটু অপ্রস্তুত দেখায়। সে বলে, আমি ভাবছি ব্যাপারটা খুব চিপ হয়ে যায় কি না। রিকশার পর্দায় আমাদের লোগো, কেমন না ব্যাপারটা?

ম্যানেজার শহীদুল ইসলাম, নো আকরাম, আই ডোন্ট অ্যাগ্রি উইথ ইউ। সিম্পল হলেই একটা জিনিস চিপ হয়ে যায় না। কায়সার আই থিংক ইউ শুড গো অ্যাহেড ইউথ দ্য আইডিয়া সুন।

কায়সারের আত্মবিশ্বাসের পারদ তখন অনেক উঁচুতে। আকরাম আলীর দিকে একটা তির্যক দৃষ্টি দিয়ে সে বলে, সে জন্যই স্যার আমি এই আর্জেন্ট মিটিংটা কল করতে বললাম। এই বর্ষার ভেতরই আমি এটা লঞ্চ করতে চাই।

শহীদুল ইসলাম, শিয়োর। মাসুদকে দ্রুত কাজে নামিয়ে দাও। মাসুদ কই? বলে তিনি টেবিলে বসে থাকা কলিগদের দিকে তাকান এবং এক কোনায় বসে থাকা মাসুদকে দেখে বলেন, মাসুদ, তোমার অন্য অ্যাসাইনমেন্ট বাদ দিয়ে কাল থেকেই কায়সারকে এই প্রজেক্টটায় অ্যাসিস্ট করো। কায়সারের এই আইডিয়াটা আগামী সপ্তাহেই একটা পাইলটিং করো।

মাসুদের চোখের পাতা আরও বার কয়েক ওঠানামা করে। সে তাড়াতাড়ি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বলে, নিশ্চয়ই স্যার।

মিটিং ভাঙলে মাসুদ দ্রুত টয়লেটে যায়। তার কেমন বমি বমি লাগে। সে চোখে-মুখে পানি দিয়ে কিছুক্ষণ বেসিনে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ইউরিনালে গিয়ে দাঁড়ায় প্রস্রাব করতে।

কিছুক্ষণ পর তার পাশের ইউরিনালে এসে দাঁড়ায় কায়সার। তার ভেতর একটা ফুরফুরে ভাব। মৃদু শিস দিতে গিয়ে আড়চোখে আরেক ইউরিনালে মাসুদকে দেখে চুপ হয়ে যায়। মাসুদ একবার তার দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

মাসুদ ও কায়সার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে। কেউ কোনো কথা বলে না। তাদের মাথার ওপর একটা নিঃশব্দতা ঝুলে থাকে। শুধু ইউরিনালে দুজনের প্রস্রাবের ধারার মৃদু শব্দ শোনা যায়।

একপর্যায়ে কায়সার ইউরিনালের দিকে তাকিয়েই মাসুদ বলে—ছুটির পর থাইকো। কথা আছে তোমার সাথে। আই হ্যাড টু ডু ইট। আই উইল এক্সপ্লেইন।

মাসুদ কিছু বলে না। টয়লেটের দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। যেতে যেতে পেছনে দরজা বন্ধ হবার শব্দ শোনে।

ছুটি হবার কিছু আগেই বেরিয়ে যায় মাসুদ। কায়সারের জন্য আর অপেক্ষা করে না। হাঁটতে থাকে ফুটপাত ধরে। তখনই বজ্রপাত শুরু হয়। তারপর রুমার ফোন আসে। মাসুদ একটা সিগারেটের দোকানের শেডের নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর শুরু হয় হয় তুমুল বৃষ্টি। ধ্যানস্থ হয়ে ঝুম বৃষ্টি দেখতে থাকে মাসুদ। সামনে রিকশা। রিকশার সামনে পর্দা। পর্দাতে তখনো লাল কবুতর নেই কিন্তু দেখা দেবে অচিরেই। ভেজা কুকুর আবার গা ঝাড়ে। মাসুদের গায়ে সেই পানি এসে লাগে। রুমার ফোন বেজে ওঠে, তুমি শেডে দাঁড়াইছ?

মাসুদের ধ্যান ভাঙে। হ্যাঁ, একটা শেডের নিচেই আছি

রুমা : বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত বের হয়ো না কিন্তু। অপেক্ষা করো।

অবশ্যই মাসুদ অপেক্ষা করবে। মাসুদ জানে অপেক্ষা করতে শিখতে হয়। মহাভারতের গল্পটা মনে পড়ে তার।

প্রজাপতির দুই রূপবতী কন্যা, কুদ্র আর বিনতা। কশ্যপ বললেন, তোমাদের বর দেব, কী বর চাও? কুদ্র বলল, আমার অত্যন্ত বলশালী এক হাজার নাগপুত্র হোক। কশ্যপ তাকে সেই বর দিলেন। বিনতা তখন বলল, আমাকে শুধু দুই পুত্র দিন, যারা কুদ্রের পুত্রের চাইতেও বলবান আর তেজস্বী হবে। কশ্যপ তাকেও সেই বর দিলেন। এর কিছুদিন পর কুদ্র এক হাজার ডিম প্রসব করলেন এবং

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বিনতা শুধু দুটো ডিম প্রসব করলেন। তারপর দিন যায়, বছর যায়। এভাবে পাঁচ শ বছর পর একদিন একসাথে কুদ্রের এক হাজার ডিম থেকে এক হাজার নাগপুত্র জন্ম নেয়। কিন্তু বিনতার ডিম থেকে কিছুই বের হয় না। বিনতা তখন অধৈর্য হয়ে ওঠে। এ সময় সে তার দুটি ডিমের একটিকে ভেঙে ফেলে ভিতরে কী আছে দেখবার জন্য। ডিম ভেঙে বিনতা দেখতে পায় ভেতরে তার পুত্রের শরীরের ওপরের অংশটা তৈরি হয়েছে মাত্র কিন্তু নিচের অংশটা তখনো অপরিণত। তার সেই অপরিণত পুত্র অধৈর্য হয়ে ডিম ভেঙে ফেলায় মায়ের ওপর খুব ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। রেগে ওই ডিমের ভেতর থেকেই মাকে অভিশাপ দেয় সে। বলে, তোমার লোভের কারণে আমার শরীর অসম্পূর্ণ হয়ে থাকল। এ জন্য তোমাকে তোমার বোন কুদ্রের দাসী হয়ে থাকতে হবে পাঁচ শ বছর। বিনিতা ছেলের এই অভিশাপে খুবই মুষড়ে পড়ে। ছেলে তখন বলে, তবে তুমি এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে যদি তোমার যে আরেকটা ডিম আছে সেটা অসময়ে না ভাঙো। সে ডিম থেকে আমার যে ভাই ভূমিষ্ঠ হবে, সে-ই তোমার দাসত্ব মোচন করবে। সুতরাং নিজে থেকে সেই ডিম না ভাঙা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

মাসুদ অপেক্ষা করবে। কোন ডিম ফেটে কে কোথায় তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে, সেটা দেখবার জন্য সে অপেক্ষা করতে প্রস্তুত।

বৃষ্টি থামলে ফ্ল্যাটে ফিরে যায় মাসুদ। তার রুমে গিয়ে ল্যাপটপের সামনে বসে। তার ফ্ল্যাটমেটরা তখনো কেউ বাসায় ফেরেনি। মাসুদ অনলাইনে সেদিনের পত্রিকা পড়তে চেষ্টা করে।

দেখে ব্রেকিং নিউজ চলছে। লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের ওপর কে একজন একটা গাড়ি নিয়ে উঠে পড়েছে পথচারীদের ওপর। মারা গেছে বেশ কয়জন। একটা মেয়ে ব্রিজ থেকে লাফ দিয়েছে টেমস নদীতে। হন্তারককে পুলিশ হত্যা করেছে। এটাকে একটা টেররিস্ট অ্যাটাক হিসেবে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। তবে সন্ত্রাসী একাকী কি না, 'লোন উলফ' কি না সেটা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

লন্ডনের সেই ক্রাইম সিনের ছবিগুলোতে চোখ বোলায় মাসুদ কিছুক্ষণ। আহত পথচারীরা পড়ে আছে রাস্তায়, অ্যাম্বুলেন্স ছুটে আসছে। তারপর অন্য পৃষ্ঠার খবরগুলো পড়তে থাকে। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্রাউজ করতে করতে একটা খবরে চোখ আটকে যায় মাসুদের :

'নেত্রকোনার দুর্গাপুর পৌর শহরে গত সোমবার রাতে এক ব্যক্তি একটি লজ্জাবতী বানর আটক করেছেন। এটির উচ্চতা প্রায় এক ফুট, লম্বায় দেড় ফুট। ওই ব্যক্তির নাম মো. আমিরুল ইসলাম। তিনি পৌরসভার চকলেঙ্গুরা এলাকার বাসিন্দা। বানরটি বর্তমানে তাঁর বাসায় রয়েছে। গতকাল প্রাণীটির ছবি দিয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাঁর ভাই তাজুল ইসলাম ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন। ওই ব্যক্তি ও উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, আমিরুল ইসলাম সোমবার রাত দশটার দিকে বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি বাড়ির সামনে টর্চলাইট জ্বালালে আলোয় একটি প্রাণীর চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। এতে তিনি ভয় পান। চিৎকার করলে বাড়ি থেকে তাঁর বড় ভাই তাজুল ইসলাম ও লোকজন আলো নিয়ে আসেন। এ সময় এ প্রাণীটি পাশের কুমড়াগাছের মাচায় ওঠে। লোকজন এটিকে আটক করে বাড়িতে এনে বেঁধে রাখে। গতকাল সকালে বাজার থেকে খাঁচা এনে প্রাণীটি রাখা হয়। খাবার হিসেবে কলা, রুটি ও ডিম দেওয়া হয়। পরে তাজুল ইসলাম ফেসবুকে প্রাণীটির ছবি দিয়ে পোস্ট দেন। দুপুরে বিষয়টি বন অধিদপ্তরের বন্য প্রাণী অপরাধ ইউনিটের পরিদর্শক আবদুল্লাহ আল সাদির নজরে আসে। পরে তিনি বিষয়টি লজ্জাবতী বানর গবেষণা ও সংরক্ষণ প্রকল্পের লোকজনকে জানান।'

মাসুদ অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খবরটা পড়ে। খবরের সাথে সেই লজ্জাবতী বানরের ছবিটা মনোযোগ দিয়ে দেখে। তারপর সে রুমাকে ফোন দেয়।

ফোন ধরে ওপাশ থেকে রুমা বলে, বাসায় পৌঁছাইছ ঠিকমতো?

মাসুদ : হ্যাঁ। পৌঁছেছি। তোমার বাসায় আজকের পেপারটা আছে না?

রুমা : আছে তো। ক্যান কী হইছে?

মাসুদ : পেপারটা একটু নাও তো।

রুমা : কেন, কোনো বিশেষ খবর আছে?

মাসুদ : তুমি নাও না।

রুমা : আচ্ছা নিলাম।

মাসুদ : আঠারো নাম্বার পেইজে যাও।

রুমা : তুমি কোন পত্রিকার কথা বলতেছ?

মাসুদ : আরে, আমি জানি তো তোমাদের বাসায় কোন পত্রিকা রাখে। তুমি আঠারো নাম্বার পেইজে যাও।

রুমা : গেলাম।

মাসুদ : ওই পৃষ্ঠার ডান দিকের কোনায় দেখো একটা খবর আছে লজ্জাবতী বানর নিয়ে। ওইটা পড়ো।

রুমা : আচ্ছা দাঁড়াও, পড়ি।

রুমা খবরটা পড়ে। মাসুদ ফোন ধরে থাকে।

রুমা : পড়লাম তো। তুমি এই বানরের খবর পড়াইতে আমাকে ফোন দিছ?

মাসুদ : ওই প্রাণীটার একটা ছবি দিয়েছে না? ছবিটা দেখো ভালো করে।

রুমা : দেখলাম তো ছবিটা। কিন্তু তোমার কী হইছে বলো তো?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাসুদ : ওর চোখগুলি দেখছ। কী ভীষণ করুণ। কেমন ভয় পেয়েছে সে।

রুমা : আচ্ছা, তোমার সমস্যা কী বলো তো? একটা বানর নিয়ে পড়লা কেন তুমি?

মাসুদ : সেইটাই তো আমার সমস্যা। এই যে এটাকে বানর বলা হচ্ছে, এটাই আমার সমস্যা। এটা তো আসলে বানর না। এটা লেমুর গ্রুপের প্রাণী। প্রাইমেট, দেখতে অনেকটা বানরের মতো কিন্তু এটা তো বানর গ্রুপের না। লোকে এটাকে বানর গ্রুপে ফেলে দিয়েছে। নাম আবার দিয়েছে লজ্জাবতী। আরে, এটা কি বানর নাকি যে মানুষের সাথে বাঁদরামি করবে? লজ্জা তো সে পাবেই। কুমড়াগাছের মাচায় তো সে উঠবেই। বেচারার জায়গা তো অন্যখানে। পথ ভুলে এখানে চলে এসেছে তারপর তাকে আবার বানর আইডেন্টির ভেতর ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এটা তো একদম ঠিক হয় নাই। এটা আনফেয়ার। ওর চোখ দুইটা দেখো। কী ভীষণ ভালনারেবল। সে তো এখানে থাকতে চায় না।

রুমা : তুমি আবার কোথাও ধাক্কা খাইছ না? তোমাকে কেউ চিট করছে। তাই না মাসুদ?

মাসুদ : সেটা কোনো পয়েন্ট না। আমি তোমাকে অন্য একটা ব্যাপার বোঝানোর চেষ্টা করছি। মানে ধরো এই যে এই প্রাণীটার বেলায় যেটা ঘটল সেটা তো মানুষের বেলাতেও ঘটতে পারে। পারে না? এমন তো হতে পারে একজন মানুষ, মানুষের ভেতর সে আছে, দেখতে হয়তো অনেকটা মানুষের মতো কিন্তু আসলে সে মানুষ না। হয়তো অন্য কিছু। হয়তো সে ভুল করে মানুষের ভেতর চলে এসেছে। আমি জিন-ভূতের কথা বলছি না। ধরো, অন্য একটা কিছু। তারপর সে মানুষের আইডেন্টির ভেতর ট্র্যাপড হয়ে গেছে। সে সেই আইডেন্টি চায় না। সে আসলে খুব লজ্জিত। সে ভীষণ ভয় আর লজ্জা নিয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছে।

রুমা : মাসুদ, তুমি ফোন রাখো। আমি তোমার ওখানে আসতেছি।

মাসুদ : না, তোমার আসার কোনো দরকার নাই। তুমি লজ্জাবতী বানরের ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো।

রুমা : আচ্ছা, আমি আসতেছি। তোমার সামনাসামনি এসে বুঝব।

ফোন কেটে দেয় রুমা। মাসুদের কাছে যাবার জন্য রওনা দেয় রুমা। উজ্জ্বল হলুদ পায়ের একটা শালিক পাখির মতো এখন সে মাসুদের ভারী হয়ে ওঠা বুকের ওপর গিয়ে বসবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উবার

একটা উবার ট্রাফিক সিগন্যালে এসে দাঁড়িয়েছে, গাড়ির জানালার কাচে টোকা দিচ্ছে এক কিশোরী, যার হাতে রঙিন তোয়ালে। কিশোরী বলছে, 'আপা, একটা তোয়াইলা নেন'। গাড়ির ভেতরের নারী নির্বিকার। তোয়ালে বিষয়ে তার কোনো আগ্রহ নাই। তবু কিশোরী গাড়ির কাচে টোকা দিতে থাকে, 'আপা, নেন না একটা তোয়াইলা'। তার হাতে হলুদ এবং গোলাপি রঙের তোয়ালে। গাড়ির ভেতরে এক বিহ্বল নারী। তিনি উজ্জ্বল তোয়ালেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেও বস্তুত তার মন বিক্ষিপ্ত এবং উদ্বিগ্ন। তার চোখ সানগ্লাসে ঢাকা। ফলে তার চোখের উদ্বিগ্নতা টের পাবার কোনো উপায় নাই। দুপুরের রোদ নারীর স্লিভলেস তাগা পরা বাহুতে এসে পড়লে সেখানে একটা বসন্ত টিকার দাগ এবং অদৃশ্য রোম দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এই নারী প্রাচীন যুগে জন্ম নিলে বাহুর এই রোম ঢাকা থাকত বাজুবন্ধে। সিগন্যাল উঠে গেলে গাড়ি ছুটে চলে। নারীর হাতের রোম আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। উবার চালক প্লেয়ারে লোকসংগীত বাজায়, 'আমি তোমার নাম লাইয়া কান্দি...

খুব সাদামাটা বৈশিষ্ট্যহীনভাবে এই সাদা উবার শহরের অগণিত গাড়ির ভেতর একটা গাড়ি হয়ে ছুটে চলেছে। ভেতরে এক উদ্বিগ্ন নারী। চলতে চলতে অতঃপর একটা বড় রাস্তার পাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় উবার। গাড়ি এখানেই দাঁড়াবে এবং গাড়িকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে তিনি নেমে যাবেন এবং আবার ফিরে আসবেন ইত্যাদি বিষয়ক বোঝাপড়া উবার চালকের সাথে আগেই সেরে রেখেছেন এই নারী। এখান থেকেই রাস্তার ওপারে নির্দিষ্ট অভিজাত হোটেলটাকে দেখা যায়। গাড়ির জানালা দিয়ে হোটেলটা ভালো করে দেখে নেন সেই নারী। তাঁর হৃৎকম্পন বাড়ে। একটা বড় শ্বাস নেন তিনি। অতঃপর তিনি তাঁর হাতব্যাগ থেকে মোবাইল ফোন বের করে একটা ফোন করেন :

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নারী : আমি আসছি। তুমি গাড়ি কোথায় রাখছ?

নারী : তুমি ঠিকমতো দেখছ?

নারী : কতক্ষণ আগে?

নারী : তোমাকে কী বলে গেছে?

নারী : ঠিক আছে, তুমি তোমার জায়গায় থাকো।

নারীর মোবাইল কথোপকথনের ব্যাপারে উবার চালকের বিশেষ কৌতূহল নাই। উবার চালকের কোনো ব্যাপারেই বিশেষ কোনো কৌতূহল নাই। তিনি যেন এক বোধিপ্রাপ্ত উবার চালক যার কোনো প্রশ্ন নাই। উবার চালক গাড়ির ভেতর বাজতে থাকা গানে বুঁদ থাকেন, 'গগনেতে ডাকে দেয়া আসমান হইলো আন্ধি, আমি তোমার নাম লাইয়া কান্দি...

এবার সেই নারী চোখ থেকে তাঁর সানগ্লাস খুলে গাড়ির সিটের ওপর রাখেন। এবং আরেকবার একটা বড় শ্বাস নেন। অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গে করে আনা একটা কাগজের প্যাকেট থেকে ধীরে বের করে আনেন কালো একটা বোরকা। ফ্যাশনবর্জিত প্রাচীন ধাঁচের নেকাব সংযুক্ত বোরকা। গাড়িতে বসেই সেই নারী বোরকাটা পরেন। টিপ টিপ শব্দ করে বোরকার সামনের টিপ বোতামগুলো লাগান। তারপর নেকাবে ঢেকে ফেলেন মুখ। তাঁর বাহুর রোম, টিকার দাগ আগেই অদৃশ্য। উবার চালক গান শুনতে শুনতে ফ্রন্ট মিরর দিয়ে নারীর এই রূপান্তর দেখেন। চোখ ছাড়া সে নারীর আর কিছু দেখা যায় না। এবার তিনি তাঁর সানগ্লাসটা পরে নেন। ফলে তাঁর চোখও অদৃশ্য হয়ে যায়।

এই নারীকে ভেতরে নিয়ে মূল রাস্তার পাশে ফাঁকা জায়গায় বেখাপ্পাভাবে দাঁড়ানো আছে উবার। রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে অবিরাম। ওই ফাঁকা জায়গায় দুজন ময়লা কুড়ানো ছেলে কয়েকটা ছেঁড়া চিপসের প্যাকেট মাটি থেকে তুলে বস্তায় ভরতে ভরতে দাঁড়িয়ে থাকা উবারের ভেতর তাকায়। সেখানে তারা আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা একজন নারীকে দেখতে পায়। তারা দুই থেকে তিনবার থেকে থেকে সেই নারীকে দেখে আবার উদাসীনভাবে সামনের একটা বিলবোর্ডের নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। সেই বিলবোর্ডে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাবান হাতে এক হাস্যোজ্জ্বল ক্রিকেট তারকাকে দেখা যায়।

গাড়ির অবস্থান, সময় ইত্যাদি নিয়ে কথা হলেও পোশাকের এই রূপান্তর বিষয়ে উবার চালকের সাথে কোনো কথা হয়নি নারীর। তিনি উবার চালককে বলেন, আপনে হয়তো ভাবতেছেন বোরকা কেন পরলাম। একটা কারণে আমাকে এই বোরকাটা পরতে হচ্ছে। যা-হোক, আপনি এখানে দাঁড়ান। আমি চলে আসব।

উবারচালক কিছু ভাবছেন না। এই শহর তিনি চেনেন। তিনি বোধিপ্রাপ্ত। একটা অভিজাত হোটেলে এই লাঞ্চ টাইমে একজন নারীকে ছদ্মবেশে কেন একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হোটেলে যেতে হয়, এ বিষয়ে তাঁর একটা ধারণা আছে। সেই ধারণা বলবৎ রেখে উবারচালক গাড়িতে বসে লোকসংগীতে মনোবিনেশ করেন। তিনি শুধু ঘাড় নেড়ে নারীকে সম্মতি জানান।

কালো বোরকায় শরীর, মুখ, চোখ অদৃশ্য করে সেই নারী গাড়ি থেকে বের হয়ে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে কিছুটা দূরের ওভারব্রিজে উঠে রাস্তার ওপরে রওনা দেন। এই পর্দানশিন নারীর দিকে ওভারব্রিজে যাতায়াতকারী অগণিত পুরুষ বিশেষ নজর দেয় না।

সেই নারী ওভারব্রিজ পেরিয়ে অভিজাত হোটেলের মূল গেটের সামনে এসে দাঁড়ান। একটা লম্বা শ্বাস নেন তিনি আবার। সাহস সঞ্চয় করে তারপর সোজা রওনা দেন গেটের দিকে। গেটের ইউনিফর্ম পরা দারোয়ান দরজা খুলে খানিকটা ইতস্তত করেন বোরকা আবৃত এই নারীকে দেখে। তিনি তাঁকে দ্বিধান্বিতভাবে সালাম দেন। এই পোশাকের কোনো নারীকে এর আগে তিনি কখনো হোটেলে ঢুকতে দেখেননি। ফলে তিনি ইতস্তত করেন। নারী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দারোয়ানকে দরজা খুলতে বলেন। দরোয়ান দরজা খুলে দেন। নারী হোটেলের লাউঞ্জে ঢুকে কোনার দিকে একটা সোফায় গিয়ে বসেন। খানিকটা দূরের একটা সোফায় একজন স্যুট-টাই পরিহিত লোক মোবাইলে আঙুল টেপাটিপি করছিলেন তিনি আড়চোখে এই বোরকা পরিহিত নারীকে একবার দেখে নিয়ে আবার মোবাইলে মনোযোগী হন। সেই নারী কোলের ওপর হাতব্যাগটা রেখে সটান বসে থাকেন। তিনি তাঁর সানগ্লাস খোলেন না, নেকাব খোলেন না। কালো মূর্তি হয়ে তিনি বসে থাকেন হোটেল লাউঞ্জে। বাইরে থেকে তাঁর হৃৎকম্প বোঝার কোনো উপায় নাই।

হোটেলের লাউঞ্জে তখন লোকজনের হাঁটাহাঁটি। মোবাইল টেপাটিপিতে ব্যস্ত ভদ্রলোক আরেকবার বোরকা ঢাকা নারীকে আড়চোখে দেখেন এবং তাঁর ভুরু কুঁচকে ওঠে। অস্বস্তি বোধ করেন তিনি এবং একপর্যায়ে সেখান থেকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উঠে সরে যান অন্যত্র। লাউঞ্জের সোফা অঞ্চল ফাঁকা হয়ে যায়। সেখানে একা বসে থাকেন কম্পমান নারী।

কোনো একটা এনজিওর কর্মীদের ওয়ার্কশপ চলছে এই হোটেলে। লাঞ্চ ব্রেকে ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীরা ডাইনিংয়ের দিকে এগিয়ে যায়। একজন কর্তাস্থানীয় কেউ জুনিয়র একজনকে বেশ উচ্চকণ্ঠে বলেন, 'আপনাকে আউটকাম ইন্ডিকেটরগুলোকে আগে ঠিক করতে হবে তো। এ ছাড়া কিসের ভিত্তিতে আপনি ইভাল্যুশন করবেন?'

কথা বলতে বলতে তাঁরা ডাইনিংয়ের দিকে হেঁটে যান। যেতে যেতে আড়চোখে একবার তাঁরা দেখেন বোরকা পরা ওই নারীকে।

রিসেপশন ডেস্কে দাঁড়ানো নারী ও পুরুষেরও এবার বিশেষভাবে চোখ পড়ে নারীর দিকে। লাউঞ্জের এক কোনায় এমন আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা, নেকাব পরা একজন নারীর এভাবে একাকী বসে থাকাটা বেমানান লাগে তাঁদের। তাঁদের হোটেলের পরিবেশের সাথে মেলে না। এ সময় হোটেলের দারোয়ানও রিসেপশন ডেস্কে এসে নিচু স্বরে কিছু একটা বলেন। সবাই সহসা সচকিত হয়ে ওঠে সোফায় বসে থাকা বোরকায় শরীর মুখ ঢাকা এই নারীর ব্যাপারে। দারোয়ান, বেল বয়, রিসেপশনিস্ট সকলে মিলে নিজেদের ভেতর নিচু গলায় কথা বলেন। কিছুক্ষণ পর রিসিপশনের মেয়েটি হেঁটে সেই নারীর কাছে যান। বলেন, ম্যাডাম, আপনি কি আমাদের হোটেলের গেস্ট?

নারী নেকাবের আড়াল থেকে খানিকটা দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলেন, না। আমি একজনের জন্য ওয়েট করছি।

ও—বলে রিসেপশনের মেয়েটা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনিও দ্বিধান্বিত থাকেন। তারপর ফিরে যান রিসেশপন ডেস্কে। কানে কানে অন্য রিসেপশনিস্ট পুরুষকে কিছু একটা বলেন। লাউঞ্জে চাপা উদ্বিগ্নতার হাওয়া বইতে থাকে যেন হঠাৎ।

নারীর হৃৎকম্পন বাড়ে।

তিনি তাঁর মোবাইল বের করে আবার ফোন করেন, তোমাকে এর মধ্যে আর ফোন দিছে?

নারী : আমাকে জানাবা। আমি হোটেলের ভিতরে আছি।

হোটেল কর্মচারীরা নারীর ফোন কথোপকথন গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ করেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মোবাইল তাঁর হাত ব্যাগে রাখেন নারী। লাউঞ্জে এয়ারকন্ডিশন চললেও বোরকার আড়ালে নারী ঘামতে থাকেন। তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বাড়ে। সানগ্লাসের আড়ালে তাঁর চোখ চঞ্চল হয়ে লাউঞ্জের চারপাশটা দেখেন। একটা বিশেষ কিছু দেখবার চেষ্টা করছেন যেন তিনি।

হোটেলের রিসেপশন ডেস্কের জটলায় একপর্যায়ে দেখা যায় হোটেলের ম্যানেজারকে। ম্যানেজার অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, সন্দিগ্ধ এবং উদ্বেগ নিয়ে আড়চোখে বোরকা আবৃত নারীকে দেখেন। কেন এ ধরনের একজন মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ না করে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে, কেন তাঁকে আরও আগেই ব্যাপারটা অবহিত করা হয়নি সবাইকে চাপা স্বরে এ নিয়ে ধমক দিতে থাকেন তিনি। ম্যানেজার অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে পায়চারি করতে করতে বেশ কয়েকটা ফোন করতে থাকেন।

একজন বোরকা পরিহিতা নারীকে প্রেক্ষাপটে রেখে হোটেলের পরিবেশে একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে। চারিদিকে একটা ভীতির সঞ্চার হয়। ডাইনিংয়ে খাবাররত সকলকে বলে দেওয়া হয়, ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত কেউ ডাইনিং থেকে বেরোতে পারবে না, অন্য কর্মচারীরা হোটেলের বিভিন্ন ফ্লোরের সিঁড়ি ও লিফটের কাছে গিয়ে দাঁড়ান, রুম থেকে কেউ বের হলে তাঁরা তাদের জানিয়ে দেন নিচে যাওয়া নিষেধ। প্রধান ফটকের দারোয়ানকে বলে দেওয়া হয় এ মুহূর্তে হোটেলে ঢোকা এবং বেরোনো নিষেধ। হোটেলের বাতাসে চাপা আতঙ্ক। সবাই একটা কোনো দুর্ঘটনার আভাস পায় যেন।

হোটেলের ভেতরের আয়োজন সম্পর্কে অজ্ঞ বোরকাবৃতা নারী কোলের ওপর হাতব্যাগ নিয়ে বসে থাকেন। আতঙ্ক তাঁর মনেও। কম্পমান হাতে, কম্পমান বুকে বসে থাকেন এই নারী। একটা কিছুর অপেক্ষায় আছেন তিনি।

রিসেপশন ডেস্কের সামনের জটলার সকলে একবার একাকী ওই নারীকে দেখে একবার হোটেলের মেইন গেটের দিকে তাকান

এই সময়েই হঠাৎ ছয়-সাতজন সশস্ত্র পুলিশ ঝড়ের বেগে হোটেলে ঢোকে। পুলিশ দলের নেতা রিসেপশনের দিকে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করেন কোন দিকে? কর্মচারীরা দেখিয়ে দিলে পুলিশ দল দ্রুত দৌড়ে সোফায় একাকী বসে থাকা বোরকাবৃতা নারীকে ঘিরে ফেলেন এবং বলেন, হ্যান্ডস আপ।

অপেক্ষারত নারী সন্ত্রস্ত হয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ান সোফা থেকে, তাঁর কোল থেকে হ্যান্ডব্যাগ মেঝেতে পড়ে যায়। নারী হকচকিত হয়ে বলেন, দাঁড়ান, শুনেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পুলিশ কর্মকর্তা চিৎকার করে বলেন, কোনো কথা বলবেন না। আগে হাত ওঠান।

নারী হাঁত উঁচু করেন।

পুলিশ দলের দুজন মহিলা সদস্য ছুটে যান নারীর কাছে, দ্রুত সক্রিয় হয়ে ওঠেন তাঁর শরীর সার্চে। অন্য পুলিশ সদস্য মেঝেতে পড়ে যাওয়া নারীর ব্যাগটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে থাকেন।

নারী হাত উঁচু করেই নেকাবের আড়াল থেকে বলতে থাকেন, শুনেন, আপনারা আমার কথা শুনেন।

দূরে দাঁড়িয়ে হোটেলের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা, আরও দূরে ডাইনিংয়ের গেস্টরা উদ্বিগ্নতায় নাটকীয় দৃশ্য দেখেন।

একজন গেস্ট চাপা গলায় বলেন, কী ডেঞ্জারাস অবস্থা দেখেন। মেয়েরাও কেমন টেররিস্ট অ্যাকটিভিটিসে জড়ায়ে যাচ্ছে এখন।

না, নারীর শরীরে কোনো সুইসাইডাল ভেস্ট বা তাঁর হাতব্যাগে কোনো বিস্ফোরক পাওয়া যায় না।

পুলিশ দলের নেতা বলেন, আপনি কে? কী করছেন এখানে?

নারী ইতস্তত করেন। বলেন, বলছি। আমি কি আপনার সাথে আলাদা কথা বলতে পারি?

পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, না, আপনি এখানেই বলেন। সবার সামনেই বলেন।

পুলিশের দল নারীকে ঘিরে থাকে।

নারী মানে, আমি আসলে সবার সামনে কথা বলতে চাই না। আপনি প্লিজ আমার সাথে আলাদা কথা বলেন, আমি সব বলছি। আমি রিকোয়েস্ট করছি।

পুলিশ দলের প্রধান কিছুক্ষণ ভাবেন। তারপর পুলিশের অন্য সদস্যদের বাইরে চলে যেতে বলেন। পুলিশ দলের প্রধানকে সালাম ঠুকে অন্য সদস্যরা হোটেলের বাইরে গিয়ে দাঁড়ান।

যে বিপদের আশঙ্কা করা হয়েছিল সেটা কেটে যাওয়াতে হোটেলের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের ভেতর একটা স্বস্তি নেমে আসে। ডাইনিংয়ের লোকেরা ফিরে যায় খাওয়ায়। তাদের ভেতর গুঞ্জন।

পুলিশ দলের প্রধান হোটেলের ম্যানেজারকে ডেকে একটা রুম দিতে বলেন যেখানে বসে কথা বলা যাবে। ম্যানেজার তাঁর রুমেই বসতে বলেন। নারী এবং পুলিশ দলের প্রধান ম্যানেজারের রুম গিয়ে বসেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পুলিশ দলের প্রধান বলেন, আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ডটা সাথে আছে?

নারীর হাত এবং বুক তখনো কাঁপছে, না, আমার সাথে এখন নাই।

পুলিশ দলের প্রধান : ঠিক আছে। এবার বলেন।

নারী : আমি কি এক গ্লাস পানি খেতে পারি?

পুলিশ দলের প্রধান ম্যানেজারের রুম খুলে এক গ্লাস পানি দিয়ে যেতে বলেন। এক কর্মচারী রুমে পানি দিয়ে আসেন। নারী নেকাব খানিকটা উঁচু করে তাঁর ভেতর দিয়েই ঢক ঢক করে পানি খান।

পুলিশ দলের প্রধান : আপনি কি আপনার বোরকার কভারটা সরাবেন। আপনার মুখ দেখা প্রয়োজন।

নারী : আমি নেকাবটা সরাতে পারব না। সরি। আমাকে রিকোয়েস্ট করবেন না।

পুলিশ দলের প্রধান বিরক্ত হন। বলেন, অন্তত আপনার সানগ্লাসটা খোলেন।

নারী তাঁর সানগ্লাস খোলেন। পুলিশ নারীর উদ্বিগ্ন দুই চোখ দেখতে পান।

ম্যানেজারসহ হোটেলের কর্মচারী, কর্মকর্তারা রিসেপশন ডেস্কে অপেক্ষা করতে থাকেন।

তখনো হোটেল থেকে কাউকে বের হতে দেওয়া হচ্ছে না, ঢুকতেও দেওয়া হচ্ছে না। সবাই কৌতূহলে অপেক্ষা করে।

ম্যানেজারের রুমে সেই নারী আর পুলিশ কর্মকর্তা আলাপ করেন।

বাইরে চাপা কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সকলে।

বেশ কিছুক্ষণ পর ম্যানেজারের রুম থেকে বেরিয়ে আসেন পুলিশ কর্মকর্তা। তাঁর পেছন পেছন সেই নারী। পুলিশ ম্যানেজারকে বলেন, 'আপনারা আপনাদের রুটিন কাজে ফিরে যেতে পারেন। এভরিথিং ইজ অলরাইট।'

পুলিশ দলের প্রধান তাঁর নারী সদস্যদের ডেকে এই নারীকে রাস্তা পার করে দিয়ে আসতে বলেন।

নারী বলেন, থ্যাংকস। ওনাদের লাগবে না। আমি একাই যেতে পারব।

নারী তাঁর সানগ্লাস চোখে লাগিয়ে হোটেলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান।

হোটেলের ম্যানেজার, রিসেপশনিস্ট, বেল বয়, এনজিও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী সকলে আড়চোখে নারীকে দেখেন। তাঁদের কৌতূহল গাঢ় হয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পুলিশ দলের প্রধান কাউকে কিছু বলেন না। শুধু তাঁর ঊর্ধ্বতন অফিসারকে একটা ফোন করে বলেন, 'স্যার, এটা অন্য কেস। আমি ফোর্স নিয়ে ফিরে আসতেছি। আপনাকে গাড়িতে উঠে ব্রিফ করতেছি।'

নারী হোটেলের গেট থেকে বেরিয়ে ওভারব্রিজে উঠে যান। হোটেলের ম্যানেজার পুলিশ দলের প্রধানের সাথে কথা বলতে চেষ্টা করেন, তিনি পরে কথা বলবেন বলে তাঁর জিপে উঠে পড়েন। অন্য পুলিশ সদস্যরা ওঠেন তাঁদের ভ্যানে।

কৌতূহল নিবৃত্ত না হওয়ায় হোটেলে অবস্থিত সকলের ভেতর হতাশা দেখা দেয়।

গাড়িতে উঠে পুলিশ অপারেশন দলের প্রধান তাঁর ঊর্ধ্বতন অফিসারকে ঘটনা বর্ণনা করেন, 'স্যার ইন্টারেস্টিং কেস...

পুলিশ অপারেশন দলের প্রধান তাঁর ঊর্ধ্বতন অফিসারের সাথে যে টেলিফোন আলাপ করেন, তা থেকে নিম্নলিখিত ব্যাপার জানা যায়।

জানা যায়, ঘটনার সাথে সন্ত্রাসের কোনো সম্পর্ক নাই। কিম্বা হয়তো আছে। একে একধরনের সন্ত্রাসও হয়তো বলা যেতে পারে। ঘটনা নারীর একান্ত ব্যক্তিগত। তাঁর দাম্পত্যবিষয়ক। ঢাকার এক অভিজাত এলাকার বাসিন্দা এই নারী। তাঁর স্বামী এক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মালিক। এই নারী হোটেলে এসেছেন মূলত তাঁর স্বামীর সাথে মোকাবিলা করতে। ঠিক মোকাবিলা হয়তো নয়। মোকাবিলার একটা আলামত সংগ্রহ করতে। নারী জানেন তাঁর স্বামী আজ এই হোটেলে আছেন। তিনি একা নাই। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন অন্য এক নারী। এবং তাঁরা এই লাঞ্চ সময়ে হোটেলের একটা রুমের ভেতর আছেন। শুধু আজকে নয়, তাঁর স্বামী প্রায়ই অফিস থেকে ক্লায়েন্টের সাথে লাঞ্চ মিটিংয়ের নাম করে সেই নারীর সঙ্গে এই হোটেলে একটা রুমে সময় কাটান। আজ তাঁর স্বামীকে হাতেনাতে ধরতে হোটেলে এসেছেন এই নারী। তিনি এসেছেন নিজের চোখে তাঁর স্বামী এবং সেই কথিত নারীকে দেখতে। কয়েকটা ভাবনা ছিল তাঁর মাথায়, তিনি নিজ চোখে ঘটনার সত্যতা যাচাই করবেন, আলামত হিসেবে আড়াল থেকে তাঁদের দুজনের একটা ছবি তুলবেন, পরিস্থিতি বুঝে সম্ভব হলে সেখানেই তাঁদের মোকাবিলা করবেন। গোপনে কাজটা করতে চেয়েছিলেন বলে তাঁর এই ছদ্মবেশ। এ নারী জীবনে কোনো দিন বোরকা পরেননি। বস্তুত বোরকাটা তিনি কিনেছেন আজকেই। তিনি খুঁজে এই পুরোনো ধাঁচের বোরকা কিনেছেন, যাতে তাঁর মুখও দেখা না যায়। তাঁর পরিকল্পনা ছিল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যতক্ষণ তাঁর স্বামী হোটেল থেকে বের না হয়, ততক্ষণ তিনি ওই লাউঞ্জে বসে থাকবেন।

জানা গেছে, তাঁর স্বামীবিষয়ক যাবতীয় তথ্য তিনি নিয়েছেন স্বামীর অফিসেরই ড্রাইভার মারফত। সেই ড্রাইভার তাঁর স্বামীকে অনুসরণ করছেন অনেক দিন ধরে এবং নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করেছেন এই নারীকে। কথিত অন্য নারীর সঙ্গে তাঁর স্বামীর এই হোটেল অভিসারের খবর নারীকে দিয়েছেন স্বামীর ড্রাইভার। এসব তথ্য সরবরাহ করবার জন্য এই নারী ড্রাইভারকে আলাদাভাবে অর্থ সাহায্যও করে থাকেন। ড্রাইভার মারফতই তিনি জেনেছেন যে আজ সকালে অফিসে যাওয়ার সময়েই সেই নারীর সাথে দুপুরে এই হোটেলে দেখা হবার পরিকল্পনা করেছেন তাঁর স্বামী। ফলে আজই এই অভিযান করবার সিদ্ধান্ত নেন এই নারী। সকাল থেকে নিয়মিত ড্রাইভারের সাথে যোগাযোগ রেখেছেন নারী, ড্রাইভার তাঁর স্বামীর গতিবিধির ব্যাপারে ধারাবাহিকভাবে জানিয়েছেন তাঁকে। স্বামীকে হোটেলে নামিয়ে হোটেলের পার্কিংয়েই অবস্থান করেছেন ড্রাইভার। নিজের পরিচয় আড়াল করবার জন্য আত্মীয়স্বজন চেনাজানা কারও গাড়ি না নিয়ে একটা উবার নিয়ে হোটেলে আসেন নারী।

এই হচ্ছে বয়ান। পুলিশ কর্মকর্তা নারীর বয়ান মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং তারপর নারীকে বলেছেন, আপনি মনে হয় দেশের নানা জঙ্গি কর্মকাণ্ডের খবরটবর রাখেন না। রাখলে এ ধরনের একটা ডেঞ্জারাস আর স্টুপিড কাজ করতেন না।

নারী বলেন, আসলে আমি খুব নিরুপায় হয়েই এই পথ নিয়েছিলাম। আমার ফ্যামিলি, ফ্রেন্ড কাউকে এর ভেতর জড়াতে চাইনি, নিজের মতো করে ব্যাপারটা মোকাবিলা করতে চেয়েছি।

এরপর এ ধরনের নাটকীয়তার বদলে বিকল্প পদ্ধতিতে দাম্পত্য জটিলতা নিরসনের পরামর্শ দিয়ে পুলিশ কর্মকর্তা সেই মুহূর্তেই তাঁকে হোটেল থেকে চলে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন।

টেলিফোনে বয়ান শুনে পুলিশ অপারেশন দলের প্রধানকে তাঁর ঊর্ধ্বতন অফিসার বলেন, 'গিয়া তো ভালোই করছ, কাউন্টার টেররিজম ইউনিটে বইসা এই সব গল্প পাইবা কই।'

ইতিমধ্যে আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা সেই নারী ওভারব্রিজ পেরিয়ে চলে গেছেন দাঁড়িয়ে থাকা উবারের কাছে।

রাস্তাজুড়ে তখন বরাবরের গাড়ি আর মানুষের কোলাহল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উবার ড্রাইভার তাঁর গাড়ির ভেতর বসে আছেন নির্বিকার। পরিপার্শ্ব নিয়ে তাঁর কোনো উৎসাহ নাই। তিনি ড্রাইভিং সিটটা পুরো নামিয়ে দিয়ে তাতে শুয়ে প্লেয়ারে গান শুনছেন। নারীকে দেখে তিনি সিট ঠিক করে সোজা হয়ে বসেন।

নারী পেছনের দরজা খুলে সিটে গিয়ে বসেন। সিটে বসে গা এলিয়ে দেন। মাথাটা পেছনে হেলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করেন।

উবার ড্রাইভার : যাব?

নারী দাঁড়ান একটু।

তিনি তাঁর স্যানগ্লাসটা খোলেন। খুলে ফেলেন বোরকা।

ফ্রন্ট মিরর দিয়ে উবার ড্রাইভার দেখেন নারীকে, তাঁকে বিধ্বস্ত দেখায়।

উবার ড্রাইভার বলেন, হোটেলের সামনে পুলিশের গাড়ি দেখলাম। রেইড দিছে না? আপনার সমস্যা হয় নাই তো?

নারী কোনো উত্তর দেন না। বলেন : আপনে গাড়ি চালান।

উবার ড্রাইভার গাড়ি ছাড়েন।

নারী মাথা সিটের পেছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজে থাকেন।

এ সময় নারীর মোবাইল বেজে ওঠে। মোবাইলের দিকে তাকিয়ে তা কেটে দেন। আবার চোখ বুজে হেলান দেন তিনি।

দুপুরের রোদ গাড়ির কাচ ভেদ করে নারীর নগ্ন বাহুতে পড়ে তার বসন্ত টিকার দাগ এবং অদৃশ্য রোম আবার দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

গাড়ি আবার এক ট্রাফিক সিগন্যালে এসে দাঁড়ায়। এবারও গাড়ির জানালায় দেখা যায় তোয়ালে। এবার তোয়ালে বিক্রি করছে কোনো কিশোরী নয়, এক প্রৌঢ় মহিলা।

উবার ড্রাইভার হঠাৎ বলেন, আপা, একটা কথা বলি?

নারী চোখ বুজেই বলেন, বলেন।

উবার ড্রাইভার কিছুক্ষণ চুপ থাকেন। তারপর বলেন, না থাক। বাদ দেন।

নারী চোখ খুলে বলেন, কেন? বলেন না। কোনো অসুবিধা নাই।

উবার ড্রাইভার, না, থাক।

গাড়িতে তখন লোকগান চলছে, 'জলেতে না যাইও তুমি কলঙ্কিনী রাধা, কদমগাছে উঠিয়া আছে কানু হারামজাদা...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অপস্রিয়মাণ তির

গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে বারবার। উন্মাদের মতো মাথা নাড়িয়েও বৃষ্টির ছাট মুছতে পারছে না ওয়াইপার। এমন তুমুল বৃষ্টি। স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে সাব্বির। গাড়ি আটকে আছে জ্যামে। পাশের সিটে বসা নীনার চোখ উইন্ডস্ক্রিনের মতোই ঝাপসা। চোখের পাতার প্রাকৃতিক ওয়াইপার দিয়ে অশ্রু মুছবার চেষ্টা করছে সে। পারছে না। রাত বেশ গভীর হলেও ঢাকার রাস্তায় তখনো গাড়ির ঢল।

হয়তো সেটাই ঠিক। দিয়েছে শাহাবই সব। গভীরতম বেদনা, অনাস্বাদিত আনন্দ। হয়তো সেটাই ঠিক, নিজেদের ভালোবাসে বলেই বস্তুত শাহাবকে ভালোবাসে নীনা আর সাব্বির। শাহাব উপলক্ষ মাত্র নিজেদের ভালোবাসার।

কাল রাত থেকে একরকম নির্ঘুম সাব্বির আর নীনা। রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা এক রাত এক দিন। ছোটাছুটি, ফোন দিগ্‌বিদিক। যদিও সতর্কতার সঙ্গে। কথা কাছের মানুষ যত কম জানে ততই মঙ্গল।

গভীর রাতে নীনা ঘুমিয়ে থাকা সাব্বিরকে ঠেলে উঠিয়েছিল, এই শোনো, এবার হবে।

সাব্বির : মানে কী?

নীনা : পেইন শুরু হয়ে গেছে। আমি টের পাচ্ছি এবার হবে।

সাব্বির : আরে না, মনে হয় ফলস পেইন।

বলে ঘুরে শোয় সাব্বির। সে আর নীনা মিলে প্রেগন্যান্সিবিষয়ক নানা রকম বই খুঁটিয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে। এ বিষয়ে একরকম বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে তারা।

নীনা বলে, মোটেও না। রেগুলার ইন্টারভেলে পেইনটা হচ্ছে।

সাব্বির উঠে বসে। নীনার ব্যথা বাড়তে থাকে। কাবু হয়ে পড়তে থাকে সে। সাব্বির তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নেয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গাড়ি পর্যন্ত যেতে পারবা না? জিজ্ঞাসা করে সাব্বির।

নীনা : পারব।

সাব্বির ড্রাইভ করে নীনাকে নিয়ে যায় হাসপাতালে। নীনাকে লেবার রুমে নিয়ে গেলে সাব্বির সারা রাত বসে থাকে ওয়েটিং রুমে। ভোররাতে যখন ওয়েটিং রুমের চেয়ারে বসে ঘুমে ঢলে ঢলে পড়ছে তখন এক নার্স তার সামনে এসে বলে, এই যে আপনার ছেলে।

সাব্বির ঘুমচোখে কাপড়ে মোড়ানো টুকরো এক মানুষের বাচ্চাকে অদ্ভুতভাবে দেখেছে। 'আপনার ছেলে' কথাটার মানে কী, বুঝবার চেষ্টা করেছে। এই খুদে মানুষটার ব্যাপারে তার কী ভূমিকা ভেবে কেমন কাবু লেগেছে তার।

ওদিকে নীনা ব্যথায় এমনিতে কাবু হয়ে আছে সারা রাত। একবার আড়চোখে নড়তে চড়তে থাকা এই মাংসপিণ্ডকে দেখে নিয়েছে সে। তৃষ্ণার্ত ওই মানুষের বাচ্চাটাকে যখন নীনার বুকে রাখা হয়, তখন তার মনে হয় সে যেন চলে গেছে গ্রহান্তরে।

নীনা আর সাব্বির তাদের প্রথম সন্তান শাহাবকে মাঝে রেখে ছবি তোলে সেদিন। আলট্রাসনো থেকে আগেই তাদের জানা ছিল, ছেলে হবে। নানা গবেষণার পর আগেই ঠিক করে রেখেছিল নাম হবে শাহাব।

শাহাবের জানা সব বন্ধুবান্ধবকে ফোন করেছে সাব্বির। তারপর করেছে আত্মীয়স্বজনকে। ফ্ল্যাটের কাউকে কিছু জানায়নি। একপর্যায়ে ফোন করেছে হাসপাতালে, মর্গে। শেষে পুলিশ। কিছু সময় বিরতি দিয়ে অগণিত বার ফোন করেছে সে সারা দিন গেছে কোনো খোঁজ দিতে পারেনি পুলিশ। তারপর আজ রাতে এই কিছুক্ষণ আগে পুলিশের ফোন, আপনারা একটু থানায় আসেন।

বাইরে ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডব। যে কাপড়ে ছিল, সে কাপড়েই সাব্বির আর নীনা গিয়ে ওঠে গাড়িতে। সাব্বির গাড়ি স্টার্ট দেয়। পাশাপাশি নীরব দুজন। উথালপাতাল বৃষ্টিতে রাস্তা দেখা যায় না ভালো। নিয়ন আলোতে ঝাপসা দেখা যায় শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপন।

নীনার মনে পড়ে শাহাব প্রথম যে শব্দটা স্পষ্ট বলেছিল, সেটা 'টিকটিকি'। বাড়ির দেয়ালের টিকটিকিগুলোর ব্যাপারে অপার কৌতূহল ছিল শাহাবের। তাদের নিয়ে অবিরাম গবেষণা। নানা অস্ফুট শব্দ উচ্চারণের পর একদিন তার সদ্য ওঠা দাঁতগুলো দেখিয়ে বলেছিল—টিকটিকি। ওকে এক ঝটকায় কোলে তুলে নিয়ে চুমুতে মুখ ভরিয়ে দিয়েছিল নীনা। শাহাবের প্রথম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাক্যটাও ছিল টিকটিকি নিয়েই। একদিন নীনা দেয়ালে টিকটিকি দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, টিকটিকি কোথায় গেছে বাবা?

শাহাব বলেছিল, টিকটিকি অফিসে গেছে।

সাব্বির অফিসে যাওয়ার আগে শাহাবকে গালে চুমো দিয়ে বলে, অফিসে যাচ্ছি বাবা। শাহাবের যে প্রিয়জন ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় সে অফিসেই যায়, অতএব অদৃশ্য প্রিয় টিকটিকিও নিশ্চয়ই অফিসে গেছে, এই ভেবেছিল শাহাব।

তিনি তো বলে গেছেন সেই কবে। বলেছিলেন এই বয়সের ছেলের মতো পৃথিবীতে আর এমন বালাই নাই। তার শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। সে স্নেহও উদ্রেক করে না, তার সঙ্গ পাওয়ার ইচ্ছাও জাগে না। শাহাব রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের সেই অনাদি অনন্ত ফটিক হয়ে উঠেছিল দিনে দিনে।

নীনা, সাব্বির লক্ষ করছিল দিনে দিনে অদ্ভুত অ্যাগ্রেসিভ হয়ে উঠেছে শাহাব। ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলাই দুরূহ হয়ে উঠেছিল তাদের। অকারণে ক্ষুব্ধ সে সব সময়। নীনা সাব্বির যে কথাই বলবে তার বিরোধিতা করা হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিয়ম। অনেক রাত জেগে তার রুমে ল্যাপটপে বসে টুকটাক টুকটাক করে শাহাব। 'লাইট বন্ধ করে ঘুমাতে যাও'—পালা করে একবার নীনা বলে, একবার সাব্বির। শাহাবের কোনো বিকার নাই। মনে হয় কোনো দেয়ালের গায়ে কথাগুলো বলছে তারা। সাব্বিরের মনে হয় কষে দুগালে চড় মারে। পারে না। নীনা-সাব্বিরের মনে হয়, শাহারেব ওপর তাদের আর যেন কোনো কর্তৃত্ব নাই। শাহাব ক্রমশ কেমন স্বয়ম্ভু হয়ে উঠেছে। এই স্বয়ম্ভু শাহাবের সঙ্গে তারা কীভাবে মোকাবিলা করবে বুঝতে পারে না।

পুলিশ সামনের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। আটকে থাকে সাব্বিরের গাড়ি। গাড়ির জানালা খুলে ছাতা মাথায় ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকা এক পুলিশকে সাব্বির জিজ্ঞাসা করে, কী ব্যাপার? পুলিশ বলে, ভিআইপি যাইব। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড সেরে অনেক রাতে বাড়ি ফিরছেন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। স্থবির গাড়ির মিছিল সেই গুরুত্বপূর্ণ মানুষের অপেক্ষা করে। বৃষ্টির তোড় আরও বাড়ে।

সাব্বিরের মনে পড়ে হয়তো বছর চার বয়স তখন শাহাবের। সাব্বির শাহাবের শিশু লিঙ্গটিকে বলত মরিচ। একদিন গোসল সেরে ন্যাংটো শরীরে শোবার ঘরে শাহাব। তোয়ালে দিয়ে শাহাবের গা মুছে দিচ্ছে নীনা।

সাব্বির বলে, শাহাব, বাবা, তোমার মরিচটা খেয়ে ফেলি?

নীনা বলে, কী বাজে কথা বলো?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সাব্বির বলে, না সিরিয়াসলি। শাহাব তোমার মরিচটা খেয়ে ফেলি?

শাহাব গম্ভীরভাবে বলে, না এখন খেয়ো না।

সাব্বির : কেন?

শাহাব : এখন মরিচটা ভিজা।

সাব্বির : ও তাই। তাহলে যখন শুকাবে তখন খাই।

শাহাব : না, তখনো খেয়ো না।

সাব্বির : কেন?

শাহাব : তাহলে হিসু করব কীভাবে।

রাতে শাহাবের সঙ্গে একসঙ্গে বসে ডিনারটা করতে চায় সাব্বির আর নীনা। কিন্তু শাহাব প্লেটে খাবার সাজিয়ে চলে যায় নিজের ঘরে। দরজা লাগিয়ে কম্পিউটারে সামনে বসে গেম খেলতে খেলতে খায়। নীনা দরজা ধাক্কা দেয়, দিনের এই একটা সময় একটু একসঙ্গে বসতে চাই, সেটাও করবে না?

দরজা খুলে এসে শাহাব বলে, ডিস্টার্ব কইরো না তো।

নীনা : মানে কী? তুমি এমন শুরু করছ কেন? তোমার রায়হান আঙ্কেল আন্টি আসল। ডাকলাম, একবার দেখা করেও গেলা না। কী মনে করবে ওরা?

শাহাব : ওরা কী মনে করবে সে জন্য আমাকে একটা কাজ করতে হবে?

নীনা : একটা মিনিমাম ভদ্রতার ব্যাপার আছে না?

শাহাব : আমার ভালো লাগে না। খামোখা যেয়ে একটা সালাম দাও। তারপর দাঁড়ায়ে থাকো। তারা জিজ্ঞাসা করবে, কী পড়ো, কোথায় পড়ো এইসব। রাবিশ। তোমাদের ফ্রেন্ডরা আসলে আমাকে আর ডাকবা না দেখা করতে।

নীনা শাহাব, তুমি এমন ইমপসিবল হয়ে উঠতেছ কেন?

শাহাব নীনার মুখের ওপর দরজা লাগিয়ে দেয়। নীনা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে।

নীনা নিজেকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে। ভেবে নিতে চায় যে ছেলে নয় আসলে কথা বলছে তার ভেতরের হরমোন। সন্তান পালনবিষয়ক বইপত্রে এসব পড়েছে নীনা।

নীনার মনে পড়ে প্রথম যেদিন চিড়িয়াখানায় নিয়ে গিয়েছিল শাহাবকে, সাব্বির আর নীনা দুজনেরই কী উত্তেজনা ছিল। অথচ শাহাবের কোনো উত্তেজনা নাই। বছর পাঁচেক বয়স তখন। নীনা হরিণ দেখায়, হাতি দেখায়। শাহাবের কোনো ভাবান্তর নাই। সিংহের খাঁচার কাছে গিয়ে নীনা, সাব্বির

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুজনই মহা উৎসাহে বলতে থাকে, জানো শাহাব এটা লায়ন। বনের রাজা। দেখছ কেমন বড় বড় কেশর।

সিংহের খাঁচার ভেতর একটা পানির ট্যাংকের মতো ছিল, খাঁচার ভেতর ঢুকে সেই ট্যাংক থেকে পানি খাচ্ছিল একটা কাক।

শাহাব হঠাৎ নীনাকে বলে, মা, দেখো দেখো কাক।

খাঁচায় জলজ্যান্ত সিংহকে রেখে শাহাবের সব মনোযোগ তখন কাকের ওপর।

সাব্বির আর নীনা সেদিন একাধারে হতাশ যেমন হয়েছিল, মজাও পেয়েছিল খুব।

কয়েক দিন ধরে একটা নতুন ট্যাব চেয়ে আসছিল শাহাব। বায়না না, দাবি। দিতে হবে।

সাব্বির বলেছিল, একটা ল্যাপটপ দিলাম আবার ট্যাবের কী দরকার?

শাহাব মুখের ওপর বলেছে, তুমি ল্যাপটপ আর ট্যাবের ফাংশনের ডিফারেন্স তো বোঝো না। তোমাকে বুঝায়ে লাভ নাই। কিছু বুঝতে পারব' না।

জ্বর গায়ে নিয়ে শুয়ে ছিল শাহাব। পাঁচ বছর বয়স তখন তার। সাব্বিরের ছোট বোন শীলা এসেছিল বাসায়। শীলা তখন গ্রেগন্যান্ট। শাহাব শুয়ে শুয়ে বলে, ওর পেটে কী হয়েছে।

নীনা : ওর পেটে একটা বাবু।

শাহাব : ফুপি বাবুটাকে খেয়ে ফেলল কেন?

সেদিন রাতে জ্বর অনেক বেড়ে গিয়েছিল। প্যারাসিটামল সিরাপ খাইয়েছে। থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর দেখেছে কিছুক্ষণ পরপর জ্বর নামেনি। সারা রাত জেগে মাথায় ঠান্ডা পানির পট্টি দিয়েছে সাব্বির আর নীনা। ঘোরের ভেতর শাহাব বলেছে, আমাকে ওই মামণির গানটা শোনাও।

নীনা চোখের পানি মুছতে মুছতে গেয়েছে, 'মা মণি তুমি বলেছিলে, আকাশের তারা হয়ে তুমি জ্বলবে...'

ছুটির দিন ছিল। বিকেলে ড্রয়িংরুমে বসে নীনা আর সব্বির চা খাচ্ছিল। নিজের রুম থেকে ল্যাপটপটা হাতে নিয়েই বেরিয়ে এসেছিল শাহাব। এসে সাব্বিরের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি শুরু করেছিল ওই ট্যাব নিয়েই।

সাব্বির বলে, পড়াশোনার খবর নাই খালি ল্যাপটপ আর ট্যাবের চিন্তায় আছ। ম্যাথসে পাইছ সি। রশীদ আঙ্কেলের ছেলে পাভেলকে দেখছ? সবগুলিতে এ আর এ স্টার। পাভেল এখনই ডিসাইড করছে মেডিসিন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পড়বে। তুমি আছ ট্যাব নিয়ে।

শাহাব : অন্যের সাথে কমপেয়ার করবা না। আমি কী পড়ব সেটা আমাকে ডিসাইড করতে দাও। তোমরা খালি তোমাদের লাভ দেখো। আমি মেডিসিন পড়লে তো তোমাদের লাভ। তোমরা মানুষের কাছে বলতে পারবা আমার ছেলে ডাক্তারি পড়ে।

সাব্বির : তোমাকে তো বলতেছি না ডাক্তারি পড়তে হবে। তোমার তো পড়াশোনাতেই কোনো কনসেন্ট্রেশন নাই। আমি দিনরাত পরিশ্রম করছি, তোমার জন্যই তো। তোমার মা তোমাকে দেখাশোনা করতেই চাকরি ছেড়ে দিল। তুমি পড়াশোনায় মনোযোগী হও, ভালো রেজাল্ট করো, মানুষ হও সে জন্যই আমাদের এত স্যাক্রিফাইস।

শাহাব : তোমাদের কে বলছে আমার জন্য স্যাক্রিফাইস করতে? তোমরা খালি তোমাদের স্যাক্রিফাইসের গল্প শোনাও। আমার হ্যাপিনেসের দিকে তো তোমাদের কোনো নজর নাই।

সাব্বির : তোমার হ্যাপিনেস তো ওই ল্যাপটপে টেপাটিপি করা। ল্যাপটপ চাইলা দিলাম এখন আবার আসছ ট্যাবের জন্য।

শাহাব বলে, কিসের টেপাটিপি করি আমি? যেটা বুঝো না সেটা নিয়ে কথা বইলো না। ট্যাবটা দিবা কি দিবা না সেইটা বলো।

সাব্বির, বেয়াদবি করবা না।

শাহাব : সত্যি কথা বললে বেয়াদবি হয়। তাই না?

সাব্বির : দেখছ নীনা কীভাবে মুখের ওপর কথা বলে?

নীনা এসব কী হচ্ছে শাহাব? এভাবে কথা বলতেছ কেন?

মুখে মুখে তর্ক করতে থাকে শাহাব। সাব্বির বলে, ট্যাব টুব কিচ্ছু পাবা না, বেয়াদব কোথাকার।

একপর্যায়ে শাহাব চিৎকার করে বলে, জানি তো দিবা না। কী দিছ তোমরা আমাকে?

সাব্বির খেপে বলে, কী দিছি মানে? কী বলতে চাও?

শাহাব আবার বলে, বলতে চাই কী দিছ তোমরা আমাকে? কিচ্ছু দাও নাই।

সাব্বির এ সময় নিজেকে আর সামাল দিতে পারে না। শাহাবের গালে এক চড় বসিয়ে দেয়।

এ সময় শাহাব ওর হাতের ল্যাপটপটা ছুড়ে মারে মেঝেতে, বলে, লাগবে না আমার কিছু।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ল্যাপটপ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

শাহাব তারপর ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। নীনা চিৎকার করে ডাকে, শাহাব, শাহাব। পেছন থেকে তাকে টেনে ধরবার চেষ্টা করে। কিন্তু দরজা সশব্দে বন্ধ করে বেরিয়ে যায় শাহাব।

সাব্বির, নীনা স্তব্ধ হয়ে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে, রাত হলেই চলে আসবে শাহাব। কিন্তু অনেক রাতেও ফেরে না শাহাব। ওর মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়। সাব্বির শাহাবের পরিচিত বন্ধুবান্ধবকে ফোন করে, আত্মীয়স্বজনকেও ফোন করে সতর্কতার সঙ্গে। কোথাও খোঁজ মেলে না। শেষে ফোন করে হাসপাতাল, মর্গ, পুলিশ।

সারা রাতেও কোনো খবর করতে পারে না পুলিশ। রাত ভোর হয়। তারা নির্ঘুম কাটায় সারা রাত। আত্মীয়স্বজনকে জানায় এক বন্ধুর বাড়িতে আছে শাহাব। পুরো দিন যায়। সাব্বির-নীনা ঘরেই থাকে। কাজের মেয়েটা রান্না করে তাদের খাওয়ানোর চেষ্টা করে। খেতে পারে না ওরা। থেকে থেকে পুলিশকে ফোন করে। সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় ঝড় বৃষ্টি। এক রাত এক দিন পর অবশেষে পুলিশ ফোন করে বলে, আপনারা থানায় আসেন।

সাব্বির উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চায়, খোঁজ পেয়েছেন আপনারা?

পুলিশ বলে, আপনারা আসেন।

রওনা দেয় দুজন।

তারা তখনো রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে পথ ছেড়ে দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে পথে। বৃষ্টি হচ্ছে তুমুল। উইন্ডস্ক্রিনে বৃষ্টির ছাটের দিকে তাকিয়ে থাকে নীনা আর সাব্বির। কথা বলে না।

দুজনের মনে পড়ে শাহাবের শেষ কথাগুলো, কী দিছ তোমরা আমাকে?

তাই তো, সাব্বির আর নীনা কী দিয়েছে শাহাবকে?

বলতে পারবে কি, 'দিয়েছি জীবন'

কিন্তু সে কি আর সত্য কথা? ওরা জীবন দেওয়ার কে? ওরা তো নেহাত উপলক্ষ মাত্র।

হয়তো সেটাই ঠিক। দিয়েছে শাহাবই সব। গভীরতম বেদনা, অনাস্বাদিত আনন্দ। হয়তো সেটাই ঠিক, নিজেদের ভালোবাসে বলেই বস্তুত শাহাবকে ভালোবাসে নীনা আর সাব্বির। শাহাব বস্তুত উপলক্ষ মাত্র নিজেদের ভালোবাসার।

বৈরুতে, বোস্টনে ছোটাছুটি করতে করতে শরণার্থী সেই কবি বলেননি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কি, 'তোমার সন্তানেরা তোমার নয়।'

জীবনের ভেতর গুঁজে থাকা যে তৃষ্ণা, তারা বস্তুত তারই সন্তান। তারা তোমাদের মাধ্যমে সংসারে আসে শুধু কিন্তু তোমাদের থেকে নয়। বাবা-মা হিসেবে ধনুক থেকে অনন্তের দিকে ছুটে যাওয়া অপস্রিয়মাণ তিরের মতো সন্তানদের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু তো করবার নেই তোমাদের। বলেননি কি সেই আরব কবি জিবরান?

তারপর একসময় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি রাস্তা পেরিয়ে যান। ছেড়ে দেওয়া হয় সাধারণের গাড়ির মিছিল। সাব্বির একসেলেটরে চাপ দেয়। থানা খুব দূরে নয়। ঝড়-বৃষ্টির ভেতর কিছুক্ষণের ভেতরেই থানায় গিয়ে পৌঁছায় তারা। গাড়ি থেকে নেমে ভিজতে ভিজতে থানায় ঢোকে সাব্বির আর নীনা।

থানার ওসি তাদের দিকে এগিয়ে আসেন। বলেন, আসেন, ভেতরে আসেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওয়ানওয়ে টিকিট

রফিকুল আলম এ মুহূর্তে প্লেনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে বাইরের মেঘ দেখছেন। মেঘের সমুদ্র। তার হাতে আমেরিকার ওয়ানওয়ে টিকিট। এর আগেও বার কয়েক তিনি আমেরিকা গেছেন কিন্তু তখন প্রতিবারই তাঁর ছিল রিটার্ন টিকিট। গেছেন, কিছুদিন থেকে চলে এসেছেন কিন্তু এবার যাচ্ছেন আর আসবেন না এই সিদ্ধান্ত নিয়ে। তাঁর কেমন যেন নিরালম্ব লাগছে। 'ওয়ানওয়ে টিকিট টু দ্য মুন' গানটা মনে পড়ছে। তাঁর করোটিতে তখন ভাবনার মাঙ্কি জাম্পিং। বানর যেমন রেন্ডমলি এক গাছের ডাল থেকে অন্য গাছের ডালে ঝুলে বেড়ায়, তার ভাবনা তেমন ডাল থেকে ডালে ঝুলছে।

অ্যারোনটিক্যাল ব্যাপারস্যাপার নিয়ে রফিকুল আলমের বিশেষ আগ্রহ আছে। অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছা ছিল তাঁর, হয়নি। শৈশবে কলসির ভাঙা চাড়া দিয়ে পুকুরে ব্যাঙ লাফ খেলার কথা মনে পড়ে তাঁর। তিনি জানেন যে প্লেন আকাশে উড়বার মূল সূত্রটা আছে ওখানে। কলসির ভাঙা চাড়ার কার্ভটার মধ্যে বাতাসের যে প্রেশার আর বাইরের যে প্রেশার এর তারতম্যের কারণেই ওটা পানির ওপর থেকে উড়ে যায়। প্লেনের ওপরে ওড়ার মূল ব্যাপারটা ওইখানে। রাইট ব্রাদার্স পদার্থবিদ্যার ওই সূত্রটাই কাজে লাগিয়েছিলেন। কলসির ভাঙা চাড়ার মতো রানওয়ে ছুঁয়ে প্লেন উঠে গেছে আকাশে। সেখানে রফিকুল আলম বসে আছেন ওয়ানওয়ে টিকিট হাতে

তাঁর বড় ভাই আমেরিকা থেকে স্পনসরশিপ পাঠিয়েছিলেন অনেক দিন আগে কিন্তু কেন দেশ ছেড়ে যাবেন, সেটা তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। রফিকুল আলমের মনে পড়ে তাঁর স্ত্রী প্রতি রাতে বিছানায় ঘুম আর জেগে থাকার সীমান্তে দাঁড়িয়ে একটা করে যুক্তি দেখাতেন কেন দেশ ছাড়া উচিত। কিন্তু রফিকুল আলম কিঞ্চিৎ গাড়ল কিসিমের। যুক্তিসমূহ তাঁর বিশেষ বোধগম্য হতো না। তাঁর স্ত্রী তখন দাবি তোলেন রফিকুল আলম যদি না যান

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিনি যেন তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেকে আমেরিকায় রেখে আসেন।

অবশেষে তাই সিদ্ধান্ত হয়। তারপর একদিন প্যাঁচার একাগ্রতা নিয়ে তাঁর স্ত্রী সুটকেস গোছান। স্ত্রীর সেই সুটকেস গোছানোর দৃশ্যটা তাঁর মনে পড়ে। তাঁর স্ত্রী সাবিহা এবং ছেলে অনিন্দ্য এখন আমেরিকার এক বিখ্যাত শহরে আছে। জমানো টাকা খরচ করে রফিকুল আলম সেই শহরে যান কিন্তু আবার দেশে ফিরে আসেন। পিং পং বলের মতো তিনি এ-কোর্ট থেকে ও-কোর্টে লাফালাফি করেছেন এত দিন। কোন কোর্টে থাকবেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। কিন্তু এবার তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তাঁর একমাত্র শ্যালিকা নায়লার মেয়ের জন্মদিনে ম্যাজিক দেখাচ্ছিলেন রফিকুল আলম। অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো ম্যাজিকেও আগ্রহ আছে রফিকুল আলমের। পারিবারিক অনুষ্ঠানে মাঝে মাঝে ম্যাজিক দেখান রফিকুল আলম। বাচ্চাদের নাকের ভেতর থেকে জাদু করে খুচরা পয়সা বের করেন। সেদিনও তাই করছিলেন। সেদিনের সেই রাতের পরই আমেরিকার ওয়ানওয়ে টিকিট কাটার সিদ্ধান্তটা চূড়ান্ত করেন রফিকুল আলম। তাঁর এককালীন বন্ধু, রফিকুল ইসলাম, প্রায় একই নামে নাম, শুধু আলম আর ইসলামের পার্থক্য, যাকে তিনি মিতা বলে ডাকতেন, যে পরে তার শ্যালিকা নায়লাকে বিয়ে করে ভায়রা হয়েছে, তার মোটা গোঁফটার কথা মনে পড়ে রফিকুল আলমের। পুরোনো বন্ধুকে একই বাড়ির সদস্য করলে মজাই হবে এই ভেবে নায়লার সাথে রফিকুল ইসলামের বিয়ের ঘটকালি তিনিই করেছিলেন। তারপর তাঁরা একই ফ্ল্যাটের তিনতলা এবং চারতলায় থাকতেন

রফিকুল আলমের মনে হয় সাম্প্রতিক বছরগুলো অ্যারোনটিক্যাল হিস্ট্রির জন্য খুব খারাপ সময়। অনেকগুলো বাজে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে এর মধ্যে। একটা মালয়েশিয়ান এয়ারলাইনস কেমন বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল। এ নিয়ে নানা রকম হাইপোথিসিস তিনি শুনেছেন। কেউ বলছে প্লেনটা ম্যাক্সিমাম অলটিচ্যুডের ওপরে চলে গিয়েছিল এবং সেখানে অক্সিজেন লেভেল কমে যাওয়ায় প্লেনের যাত্রী থেকে শুরু করে পাইলট সবাই মারা যায়। পাইলট মারা গেলেও প্লেন অটোতে অনেকক্ষণ চলতে পারে। একা একা অনেকক্ষণ চলার পর প্লেনটা সমুদ্রে পড়ে গেছে। একটা প্লেন চলছে ঘণ্টাখানেক ধরে অথচ এর সব যাত্রী, পাইলট মৃত, দৃশ্যটা ভেবে অবাক লাগে রফিকুল আলমের। কেউ কেউ বলেছে প্লেনটাকে আসলে আমেরিকা গায়েব করে দিয়েছে। আজকের পৃথিবীতে এত বড় একটা অবজেক্ট পৃথিবী থেকে হাওয়া হয়ে যাওয়া তো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অসম্ভব। তবে আমেরিকা সিকিউরিটির নামে, মিলিটারি রিসার্চের নামে বহু রকম এক্সপেরিমেন্ট করে থাকে। অনেকে মনে করে, ওরাই ওই বিমানটাকে কোথাও নামিয়ে ফেলেছে। ওরা ড্রোন তৈরি করেছে পাইলট ছাড়াই যাতে প্লেন চলতে পারে সে ব্যবস্থা করতে। এখন হয়তো কোনো নতুন ডিভাইস তৈরি করেছে যেটা দিয়ে তারা কোনো উড়ন্ত বিমান মাটিতে নামাতে চায় তারা একটা এক্সপেরিমেন্ট হয়তো করেছে ওই মালয়েশিয়ান প্লেনটার ওপর। কোনো নির্জন দ্বীপে হয়তো নামিয়েছে সেই প্লেন। আমেরিকার দখলে তো পৃথিবীর কত জায়গায় কত দ্বীপ আছে। সে রকম কোনো একটা দ্বীপে হয়তো নামিয়ে বিমানটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে তারা। এগুলো একধরনের কন্সপিরেসি থিওরি কিন্তু রফিকুল আলমের কাছে এই থিওরি একেবারে অমূলক মনে হয় না। আমেরিকা তো ধুরন্ধর দেশ, এমন কিছু করা অসম্ভব না তাদের জন্য। তিনি অবশ্য সেই ধুরন্ধর দেশেই যাচ্ছেন।

এসব যখন উনি ভাবছেন তখন বিমানবালা রফিকুল আলমের কাছে জানতে চান, ভেজ অর নন-ভেজ?

রফিকুল আলমের মনে হয় বিমানের ভেতরের এই সরু গলিকে আলোকিত করে রাখেন এই সব নারী। তাঁরা ব্যাপক সেজেগুজে থাকেন। এটা তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব। তাঁদের কেমন যেন প্লাস্টিকের তৈরি বলে মনে হয় রফিকুল আলমের। তবু আকাশের ভেতরের এই বাড়ির অতিথি হয়ে বসলে এই প্লাস্টিক নারীরা যখন আপ্যায়ন করতে আসেন তখন রফিকুল আলম ভুলে যান যে শূন্যে খুব বিপজ্জনকভাবে ভেসে আছেন। রফিকুল আলম নন-ভেজ খাবার নেন।

ট্রাভেল এজেন্টের ম্যানেজার এবার বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন রফিকুল আলমকে—ব্যাপার কী ভাই, কোনোবার তো ওয়ানওয়ে টিকিট কাটেন না, এবার হঠাৎ?

কিন্তু ট্রাভেল এজেন্টের ম্যানেজারকে কী বলবেন তিনি? ব্যাপার জটিল, এই জটিলতা তাঁকে কী করে বোঝাবেন? রফিকুল আলম বরং তাঁকে বলেন, সবাই তো বরং জিজ্ঞাসা করে আগে কেন ওয়ানওয়ে টিকিট কাটিনি, কেন বারবার ফিরে এসেছি।

ম্যানেজার : তা তো ঠিকই। দেশ ছেড়ে যাওয়ার তো এক শ একটা যুক্তি আছে। আমার এক বন্ধু সেদিন চলে গেল অস্ট্রেলিয়া, বলছিল অন্তত বাচ্চাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখন দেশ ছাড়া উচিত।

রফিকুল আলম বলেন, এসব আসলে হিপোক্র্যাট যুক্তি। যারা এসব বলে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিদেশে যাওয়ার লোভ তাদেরও কম নাই। বাচ্চাদের ঢাল বানিয়ে মহৎ হবার চেষ্টা করে আরকি।

ম্যানেজার: কিন্তু ভাই, বিদেশে গেলে অন্তত পেট্রলবোমায় তো পুড়ে মরতে হবে না?

রফিকুল আলম: বোমা তো ভাই লন্ডনের বাসেও পড়ে। পড়ে নাই? বাসের বোমায় বহু লোক মারা গেছে সেখানে। সেদিন অস্ট্রেলিয়ার এক কফি শপে ঢুকে এক লোক গুলি করে মেরে ফেলল কফি খেতে আসা নিরীহ লোকজনকে। কতগুলো এয়ারপোর্টে, এমনকি সিনেমা হলেও টেররিস্ট অ্যাটাক হলো। তো রিস্ক কোথাও কম নাই, বুঝলেন? আসল কথা হচ্ছে, পৃথিবীতে বিশ্বাসের আর কোনো জায়গা নাই। পৃথিবীটা একটা ডেঞ্জারাস জায়গা হয়ে গেছে। আর শুনেন ভাই, ওই যে পেট্রলবোমার কথা বললেন না? কথা হচ্ছে যারা এই দেশ থেকে মাইগ্রেশনের চিন্তা করে তারা কেউ ওই সব বাসে চড়ে না যেখানে বোমা পড়ে, বুঝলেন?

রফিকুল আলমের হাতে দেশ না ছাড়ার নানা রকম যুক্তি তবু তাঁর হাতে ওয়ানওয়ে টিকিট।

রফিকুল আলমের মাথায় ভাবনার বানর লাফ।

আরও একটা অ্যারোনটিক্যাল ডিজাস্টারের কথা মনে পড়ে তাঁর। মালয়েশিয়ান এয়ারলাইনসের আরেকটা প্লেনের কথা মনে পড়ে, যেটাকে মাটি থেকে কামান মেরে ভুল করে উড়িয়ে দেওয়া হলো। কামানটা রাশানরা না ইউক্রেনরা মেরেছে, সেটা নিয়ে বিতর্ক চলল। বেচারা মালয়েশিয়ান এয়ারলাইনসের প্লেনটাকে ভুল করে তারা ভেবেছিল শত্রুর প্লেন। রফিকুল আলমের আবারও মনে হয় সমস্যার মূলে হচ্ছে ওই সন্দেহ আর অবিশ্বাস। পৃথিবীটা যে একটা অ্যাবসোল্যুটলি আনপ্রেডিকটেবল জায়গা হয়ে গেছে, এটা যে একটা ডেঞ্জারাস প্লেসে পরিণত হয়েছে সে ব্যাপারে এখন সে নিশ্চিত। এই বোধ রফিকুল আলমের খুব হয়েছে যে কাউকে বিশ্বাস করার আর কোনো উপায় নাই এখন। তাঁর মনে হয় ট্রাভেল এজেন্টের ম্যানেজারকে অন্তত এইটুকু তিনি বলতে পারতেন যে তাঁর ওয়ানওয়ে টিকিট কাটার পেছনে আসলে রয়েছে এই বিশ্বাসহীনতারই সংকট।

শ্যালিকা নায়লার মেয়ের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ম্যাজিক দেখানোর সেই রাতে পুলিশের সাথে যে এনকাউন্টার তাঁর হয়েছে, এর আগে মাত্র একবার একজন পুলিশের সাথে খানিকটা কথাবার্তা হয়েছিল রফিকুল আলমের। এ ছাড়া থানা-পুলিশ ইত্যাদি থেকে শত হাত দূরে থাকেন তিনি। সেদিন রাতের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চিটাগাং মেইলে ঢাকা ফিরছিলেন রফিকুল আলম। সকাল হয়ে গেছে। ততক্ষণে ট্রেন ঢাকা পৌঁছে যাবার কথা কিন্তু রাতে কোনো এক স্টেশনে ট্রেন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল বলে সেদিন দেরি হয়েছিল ঢাকা পৌঁছাতে। ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে চারজন থাকার কথা থাকলেও সেদিন সেই কেবিনে ছিলেন তিনজন। রফিকুল আলম ছাড়া একজন মাঝবয়সী লোক এবং একজন অপেক্ষাকৃত তরুণ বাটিছাঁট চুল। সারারাতের ঘুমের পর তাঁরা সকালে বসে কথা বলেছিলেন। বিমানের নন-ভেজ মেনুর চিকেনে কাঁটাচামচ গেঁথে দাঁতে কামড় দিতে দিতে চিটাগাং মেইলের সেদিনের সেই আলাপচারিতার কথা মনে পড়ে তাঁর।

মাঝবয়সী লোকটা বাটিছাঁট লোককে বলেন, ভাই, মনে হয় আর্মির, না হয় পুলিশের লোক।

বাটিছাঁট : পুলিশের। কেবল ট্রেনিং শেষ করলাম। ঢাকায় জয়েন করতে যাচ্ছি। বাবা-মার সাথে দেখা করতে গেছিলাম।

মাঝবয়সী লোক : আচ্ছা। তা ভাইয়ের পোস্টিং কোথায় হইল?

বাটিছাঁট : রেলওয়ে পুলিশে। এই ঢাকা-চিটাগাং লাইনেই।

মাঝবয়সী লোক বেশ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন : তাইলে তো খুবই ভালো কথা। আপনারে আমার দরকার, আমারেও আপনার দরকার।

বাটিছাঁট : মানে কী?

মাঝবয়সী লোক রফিকুল আলমের পরিচয় জানতে চান। রফিকুল আলম জানান।

মাঝবয়সী লোক রফিকুল আলমকে বলেন, আপনে কিছু মনে কইরেন না। আমি এখন ওনার সঙ্গে একটা আলাপ সারব। মনে করেন যে আপনে এই আলাপ শুনেন নাই।

রফিকুল আলম বলেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, অসুবিধা নাই।

মাঝবয়সী লোক বাটিছাঁট লোককে বলেন, শুনেন, আপনাকে আমার লাগবে আর আমাকেও আপনার লাগবে। কারণ, আমি এই ঢাকা-চিটাগাং রুটেই চোরাচালানের মাল আনা-নেওয়া করি।

বাটিছাঁট : আপনি কী বলতে চান?

মাঝবয়সী লোক : বলতে চাই যে আমি একজন চোরাকারবারি। তো এখন আপনাকে আমার লাগবে না? আপনাকে আমার হাতে রাখা লাগবে না?

বাটিছাঁট লোকটা হাসেন। রফিকুল আলমের দিকে তাকিয়ে বলেন, উনি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এসব কী বলতেছেন? পুলিশের সামনে বসে কী সব কথা বলতেছেন, দেখছেন?

মাঝবয়সী লোক : ওনারে বইলা দিছি। উনি এখন কিছু শুনবেন না। উনি আপাতত কালা। ওনার কথা ভুইলা যান। আপনি আমারে সত্য কইরা বলেন তো এই যে পুলিশে ঢুকছেন, কত টাকা ঘুষ দেওয়া লাগছে?

বাটিছাঁট : ঘুষ দিব কেন? আপনি কী বলতেছেন এসব।

মাঝবয়সী লোক না, শুনেন, আপনি খালি আমারে অ্যামাউন্টটা বলেন। কত টাকা?

বাটিছাঁট হাসেন : আপনি তো ভাই গ্যাঞ্জামের মানুষ।

মাঝবয়সী লোক : গ্যাঞ্জামের কী দেখলেন আপনি? আচ্ছা, আপনি বলতে লজ্জা পাইতেছেন ঠিক আছে। কিন্তু আমি তো সব রেট জানি। আপনে যে কনস্টেবল পোস্টে না সেইটা আগেই বুঝছি, আপনে আরও উপরের পোস্টে। তো আমি মোটামুটি ধইরা নিতে পারি যে আপনে পাঁচ লাখ টাকার কম দেন নাই।

রফিকুল আলম গভীর কৌতুক নিয়ে এই লোকের কথা শোনেন।

মাঝবয়সী লোক শুনেন, এই যে পাঁচ লাখ টাকা দিছেন এইটা তো তুলতে হবে আপনারে, হবে না? তুলবেন তো আমাদের কাছ থেইকাই। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি আপনে লাইনঘাট চিনবেন তত তো ভালো, ভালো না?

বাটিছাঁট : শুনেন, আমি কিন্তু আপনাকে অ্যারেস্ট করতে পারি।

মাঝবয়সী লোক না, আপনে পারেন না। আপনে তো এখনো জয়েন করেন নাই কথা সেইটা না আমারে অ্যারেস্ট কইরা তো আপনার কোনো লাভ হবে না বরং ক্ষতি হবে। ওই সব কথা বাদ দেন। শুনেন পুলিশ ভাই। আপনি একেবারে ফ্রেশ তো তাই এত কিছু ভাবতেছেন। কিছুদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে সব। আমার সাথে এইভাবে যে আপনার দেখা হইল এইটা আপনার লাক বলতে পারেন। আমার লাইনের সাথে যত তাড়াতাড়ি আপনার যোগাযোগ ঘটবে, ততই ভালো। আপনার মোবাইল নাম্বারটা দেন আমারে, বিমানবন্দর স্টেশন চইলা আসছে আর দেরি নাই।

বাটিছাঁট না ভাই, আমার নাম্বার আপনাকে আমি দিব না।

মাঝবয়সী লোক ঠিক আছে দিয়েন না। আমার নাম্বারটা রাখেন। এই যে আমার কার্ড, আমার নাম আবুল কাশেম। কার্ডটা রাখেন কাজে লাগবে আপনার।

যে দেশে প্রকাশ্যে পুলিশের সাথে এ ধরনের আলাপ হয় সে দেশে থাকার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তো কোনো যুক্তি নাই, এমন একটা কনক্লুশনে সহজেই আসা যেতে পারে। কিন্তু রফিকুল আলম বেকুব কিসিমের লোক। তিনি ব্যাপারটাকে অন্যভাবে ভাবেন। ভাবেন, এ ঘটনা প্রমাণ করে আমাদের প্রশাসন কত ইনফরমাল, কত ফ্লুইড, কত ট্রান্সপারেন্ট। তাঁর এ-ও মনে হয় যে দুইজনের মধ্যে কথোপকথনে তো একটা অ্যাবসলিউট লাইফ এন্টারটেইনমেন্ট। কারও বাপের সাধ্য আছে আমেরিকার কোনো ট্রেনে এমন অসাধারণ বিনোদন পাওয়ার?

যে বার কয়েক তিনি আমেরিকায় গেছেন তখন সেখানকার প্রবাসীদের জীবন দেখে রফিকুল আলমের কেমন যেন প্যারাডক্সিকাল মনে হয়েছে। দেখেছেন দুর্দান্ত সব মনুমেন্টের পাশে, চৌকস শপিং মলের সামনে, অপরূপ পার্কের ভেতরে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে তাঁরা ফেসবুকে আপলোড করেন, একটা বেশ সুখী সুখী ইমেজ তাঁরা তুলে ধরেন পৃথিবীর সামনে। কিন্তু রফিকুল আলম জেনেছেন তাঁদের অধিকাংশেরই প্রবাসের গোপন অনেক সংগ্রাম আছে, বেদনা আছে। রফিকুল আলমের মনে হয়েছে সুখী পাবলিক সত্তার আড়ালে তাঁরা তাঁদের দুঃখী প্রাইভেট সত্তাকে ভুলিয়ে রাখেন। তিনি দেখেছেন তাঁদের পায়ের নিচে বাংলাদেশ না থাকলেও সবাই বুকের মধ্যে একটা বাংলাদেশ নিয়ে ঘুরে বেড়ান। বিদেশে বসে তাঁরা নিজেদের মতো একটা মিনি বাংলাদেশ বানিয়ে নেন। হিম তুষারে একে অন্যের বাসায় দাওয়াতে গিয়ে সরিষা ইলিশ দিয়ে ভাত খেয়ে ফায়ার প্লেসের পাশে বসে যুদ্ধাপরাধের বিচার নিয়ে বিতর্ক করেন।

বিমানের জানালা দিয়ে নিচে অস্পষ্ট সাগর দেখতে দেখতে রফিকুল আলমের মনে পড়ে যে ভদ্রলোকের বাসার একটা অংশে আপাতত তাঁর স্ত্রী আর ছেলে উঠেছে তিনি তাঁকে বলেছিলেন, 'বুঝলেন ভাই, মার সাথে আজকে স্কাইপে কথা হচ্ছিল, এ সময় শুনি বাইরে রাস্তায় কুকুর ডাকতেছে। কী যে ভালো লাগল জানেন? দেশের কুত্তার ডাকও কী সুন্দর রফিকুল আলম দেখেছেন আমেরিকায় বসে নিজের মনের ভেতর একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করে প্রবাসীরা সেই সুড়ঙ্গপথে দেশে চলে যান। রফিকুল আলম এসব দেখে খানিকটা বিহ্বল থেকেছেন কারণ প্যারাডক্স বহন করার শিক্ষা তাঁর নাই। তিনি বরং হাঁদার মতো ভেবেছেন মনের সুড়ঙ্গপথে না তিনি সশরীরে দেশে চলে আসবেন। ফলে প্রতিবারই তাঁর হাতে ছিল রিটার্ন টিকিট।

শ্যালিকা নায়লার বাড়ির কাজের মেয়ে কিশোরী নিদ্রাসুন্দরীর কথা মনে পড়ে রফিকুল আলমের। নিদ্রাসুন্দরীর বাড়ি নালিতাবাড়ী। এমন অদ্ভুত নাম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিনি শোনেননি কখনো। অবাক হয়ে ভেবেছেন স্লিপিং বিউটির বাংলা অনুবাদে কে রেখেছে মেয়েটার এই নাম? রফিকুল আলমের অবাক হবারও বাতিক আছে। বুদ্ধিমান লোকেরা অবাক হয় না। কিন্তু বুদ্ধিমান হিসেবে তাঁর কোনো সুনাম নাই। ফলে অনেক কিছুতেই তিনি অবাক হন। তিনি মেয়েটাকে বলে রেখেছিলেন, তার বাবা যখন মেয়ের বেতন নিতে আসবেন তখন যেন অবশ্যই তাঁর সাথে দেখা করেন। নিদ্রাসুন্দরী নামের রহস্য উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন রফিকুল আলম। কিন্তু না, সে সুযোগ তিনি পাননি।

সালাদের বাটিতে কাঁটাচামচ চালান রফিকুল আলম। এ সময় প্লেন কিছুটা বাম্পিং করে। পাইলট সিটবেল্ট বেঁধে নিতে বলেন। রফিকুল আলমের তখন সেই জার্মান কো-পাইলটটার কথা মনে পড়ে যে নিজেই প্লেনটাকে সোজা মাটিতে নামিয়ে ধ্বংস করে ফেললেন। আত্মহত্যা করলেন সবাইকে নিয়ে। জানা যায় সেই কো-পাইলটের মানসিক সমস্যা ছিল। রফিকুল আলমের মনে হয় এই যে তাঁদের প্লেনের পাইলট ঘোষণা দিচ্ছেন, কে জানে এর কোনো সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার আছে কি না। এই পাইলটের যদি মনে হয় সবাইকে নিয়ে এবার সোজা প্লেনটাকে সমুদ্রে নামিয়ে দিই, কিছু তো করার নাই। এই সালাদ খেতে খেতেই তখন তিনি টুপ করে অন্য সবার সাথে মিলে সমুদ্রে ডুবে যাবেন। এই আকাশে যে মানুষটার ওপর বিমানের সব কটা যাত্রীর ভবিষ্যৎ তাঁকেও বিশ্বাস করার কোনো উপায় নাই। হ্যাঁ, ব্যাপারটা বিশ্বাসেরই, আবারও মনে হয় তাঁর।

এক প্রবাসী রফিকুল আলমকে বলেছেন ঢাকা শহরের ধুলাবালি, যানজট এগুলোর ভিতর থেকে বাঁচার জন্য দেশ ছেড়েছেন তিনি। রফিকুল আলম তখন সেই প্রবাসীকে বললেন, ভাই শুনেন, আমার বউ আর আমি একদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন আমার চোখে কী যেন একটা ময়লা পড়ল, তো আমার বউ আমাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে ওর আঁচলের ডগাটা সরু করে পেঁচিয়ে চোখ থেকে ময়লাটা বের করে দিল। তো আমেরিকার এই বিখ্যাত শহরের বাতাসে তো ধুলা-ময়লাও নাই। ফলে এখানে আমার চোখে ধুলা পড়ার উপায় নাই আর আমার বউ ওইখানে শাড়িও পরে না। সুতরাং ওই যে ওর আঁচল দিয়ে বউ আমার চোখের ময়লা পরিষ্কার করে দিল, এই চমৎকার দৃশ্য আমেরিকার এই শহরে তৈরি হওয়ার তো কোনো সুযোগ নাই। আছে?

রফিকুল আলমের এই অতি সরল, রোমান্টিক যুক্তি সেই প্রবাসীর বিস্তর হাসির খোরাক জোগায়।

রফিকুল আলম এবং রফিকুল ইসলাম একই ডিপার্টমেন্টের একই বছরের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছাত্র। ফিজিকস ডিপার্টমেন্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছর থেকেই বন্ধু দুজন। ফিজিকসের নানা বিষয় নিয়ে কথা বলতেন তাঁরা। ল অব থার্মোডিনামিকস, বিগ ব্যাং থিওরি নিয়ে বিতর্ক করতেন। কিন্তু এ দেশে পদার্থবিদ্যার পণ্ডিতকে কে আর পদার্থবিদ্যা চর্চা করতে দেয়? পাস করার পর রফিকুল ইসলাম ব্যবসা শুরু করেন আর রফিকুল আলম শুরু করেন একটা প্রাইভেট কোম্পানির চাকরি। তবে দুজন দুই রকম পেশায় চলে গেলেও রফিকুল আলমের সাথে রফিকুল ইসলামের যোগাযোগ ছিল। শ্যালিকা নায়লার বিয়ের কথা উঠলে রফিকুল আলমই রফিকুল ইসলামের কথা তোলেন। অতঃপর বিয়েটা ঘটে এবং বিয়ের পর তাঁদের অ্যাপার্টমেন্টের নিচের ফ্ল্যাটেই থাকতে শুরু করেন রফিকুল ইসলাম আর নায়লা। আলম আর ইসলাম পরস্পরকে মিতা ডাকা অব্যাহত রাখেন।

কিন্তু বিয়ের পর আলম এক নতুন ইসলামকে আবিষ্কার করতে শুরু করেন। তিনি লক্ষ করেন, তাঁর সঙ্গে গডস পার্টিকেল নিয়ে কথা বলতে চাইলে সে কী সব শেয়ার মার্কেটের আলাপ করে। রফিকুল আলম লক্ষ করেন অচিরেই রফিকুল ইসলাম তার শ্বশুরের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে। স্ত্রী সাবিহার কাছ থেকে জানতে পারেন, রফিকুল ইসলাম তার শ্বশুরের গ্রামে বেদখল জমিগুলো দখল করে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে পুলিশে তার ভালো যোগাযোগ আছে বলে জানিয়েছে সে। পুত্রসন্তানবিহীন তার শ্বশুর তাঁর এই করিতকর্মা ছোট জামাইয়ের কর্মতৎপরতায় সবিশেষ মুগ্ধ। শ্বশুর সাহেব অনেক আগেই টের পেয়েছিলেন যে তাঁর ওই ম্যাজিক দেখানো বড় জামাই রফিকুল আলমকে দিয়ে কিছু হবে না। কিন্তু এত দিন তাঁর কোনো বিকল্প ছিল না। নানা বৈষয়িক ব্যাপারে আলাপ তোলার চেষ্টা করেছেন রফিকুল আলমের সাথে কিন্তু দেখেছেন তিনি শুধু কোথায় কোন প্লেন অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, ফিজিকসে এবার কে নোবেল পুরস্কার পেল—এসব নিয়ে কথা বলেন। শ্বশুর সাহেব বেশ হতাশই ছিলেন এ নিয়ে। কিন্তু তাঁর ছোট জামাই রফিকুল ইসলামকে পেয়ে তাঁর সব হতাশা কেটে গেছে। তাঁর সঙ্গে প্রাণভরে বিষয়-আশয় নিয়ে কথা বলেন তিনি। তাঁকে তাঁর জমিজমার ব্যাপারগুলো মীমাংসা করবার জন্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নিও দিয়ে দিয়েছেন তিনি। রফিকুল ইসলাম দিনে দিনে রফিকুল আলমকে এড়িয়ে চলতে থাকেন। আলম লক্ষ করেন তাঁর চোখের সামনে ইসলাম ক্রমশ কেমন একটা শকুনে পরিণত হচ্ছে। একদিন ইসলাম আলমকে মিতার বদলে 'বলদ' বলে ডাকেন। আমেরিকার স্পনসরশিপ নিয়েও যে লোক এ দেশে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পড়ে থাকে, তার চেয়ে বড় বলদ আর কে হতে পারে? এই কথা ইসলাম আলমকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ বোঝান। তাঁদের সম্পর্ক খারাপ থেকে তিক্ততার দিকে যেতে থাকে। বিমানের জানালায় তাকিয়ে তাঁর বন্ধু রফিকুল ইসলামের মোটা গোঁফটার কথা তাঁর আবার মনে পড়ে।

এক প্রবাসী একদিন রফিকুল আলমকে তাঁর বাড়িতে রাখা একটা স্যুটকেসের গল্প শুনিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ওই দেশে যাওয়ার সপ্তাহখানেক পরেই উনি তাঁর জিনিসপত্র ওই সুটকেসে গুছিয়ে ফেলেছিলেন। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, না ওই দেশে আর কিছুতেই থাকবেন না, দেশে ফিরে যাবেন তখনই। কিন্তু তারপর মনে হয়েছে এত টাকাপয়সা খরচ করে আসলেন আর কয়টা মাস দেখে যাবেন। হয়তো ম্যাক্সিমাম ছয় মাস। তারপর কখন যেন কী কী সব ঘটতে লাগল। তিনি একটা কাজ পেলেন, তাঁর স্ত্রী প্রেগন্যান্ট হলেন। কখন যেন তাঁদের একটা মেয়ে হলো, একদিন সেই মেয়ে ইংরাজিতে কথা বলতে শুরু করল। ভাবলেন মেয়েটা প্রাইমারি শেষ করলেই ওকে নিয়ে দেশে ফিরবেন। তাঁর গোছানো সুটকেস আগের মতোই থাকল। মেয়েটা আরেকটু বড় হলে দ্বন্দ্বে পড়লেন বাচ্চাটাকে এখন দেশে নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে? এই করতে করতে একসময় দেখলেন নিজেদেরও বয়স বেড়ে গেছে। শরীর-টরীর খারাপ হয়, দেশের চিকিৎসার যে খোঁজখবর পান তা শুনে ভয় হয় তাঁদের। এখানকার মেডিকেলের যে সুযোগ তার লোভে পড়ে আর দেশে ফিরবার সাহস হয় না। এভাবে বিশ বছর পার হয়ে গেছে তাঁদের। লোকটা বলেন, তাঁর সেই সুটকেস কিন্তু এখনো গোছানোই আছে। মাঝে মাঝে সুটকেসটার কাছে যান তিনি, তাঁর মনে হয় হাতে নিয়ে এখনই রওনা হয়ে যাবেন কিন্তু আর রওনা হওয়া হয় না' রফিকুল আলমের মনে পড়ে সেই প্রবাসী তাঁকে বলেছিলেন, 'বুঝলেন ভাই, প্রবাসজীবন হচ্ছে চোরাবালির মতো, ওটা শুধু আপনাকে নিচের দিকে টানবে।' রফিকুল আলম সেসব জেনেই ওয়ানওয়ে টিকিট হাতে সেই চোরাবালিতে পা রাখতে যাচ্ছেন।

ব্যাপারটা ক্লাইমেক্সে যায় রফিকুল আলমের শ্বশুরের মিরপুরের বাড়িটাকে কেন্দ্র করে। পুরোনো দিনের চারতলা বাড়ি। রফিকুল ইসলাম বলেন, তিনি ওটাকে ডেভেলপারকে দিয়ে নয়তলা ফ্ল্যাট বানিয়ে দেবেন। আলম বলেন, ওখানে নয়তলার পারমিশন নাই। ইসলাম বলেন, তিনি সেটা ম্যানেজ করে নেবেন। আলম অবজেকশন দেন। কিন্তু রফিকুল আলম চাকরিবাকরি করেন, ফিজিকসের আলাপ করেন, ম্যাজিক দেখান তাঁর মতো বেকুবের কথাকে পাত্তা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না তাঁর শ্বশুর। রফিকুল ইসলাম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাঁর শ্বশুর, সাবিহা, নায়লা সবাইকে কে কয়টা করে ফ্ল্যাট পাবে এসব হিসাব দিয়ে স্বপ্ন দেখায়। আর সেই সব স্বপ্নের ভেতর বাগড়া দেওয়াতে রফিকুল আলমের ওপর তাঁর শ্বশুর, স্ত্রী সাবিহা ও শ্যালিকা নায়লা—সবাই বিরক্ত।

বিমানের সিটটা পেছনে হেলিয়ে দিয়ে রফিকুল আলম তাঁর এককালীন বন্ধু রফিকুল ইসলামের সাথে তাঁর শেষ সংলাপগুলো মনে করবার চেষ্টা করেন।

আলম : ইউ আর গোয়িং টু ফার।

ইসলাম : মানে?

আলম : তুই বাড়াবাড়ি করতেছিস।

ইসলাম : কী করতেছি?

আলম : বাড়াবাড়ি।

ইসলাম : কী রকম?

আলম : ধান্দাবাজি করে মাল কামানোর চেষ্টা করতেছিস।

ইসলাম : কী করে?

আলম : ধান্দাবাজি।

ইসলাম : কিসের চেষ্টা করতেছি?

আলম : মাল কামানোর।

ইসলাম : ও আচ্ছা, তো কী করতে হবে আমাকে?

আলম : এসব ছেড়ে দিবি।

ইসলাম : এই সব ধান্দাবাজি ছেড়ে দেব?

আলম : হ্যাঁ, ছেড়ে দিবি।

ইসলাম : আর না ছাড়লে?

আলম : তোকে আমি পুলিশে দিব।

ইসলাম : কিসে দিবি?

আলম : পুলিশে।

ইসলাম : ও তাই? ভালো কথা, সুপ্তির জন্মদিনে ম্যাজিক দেখাচ্ছিস তো?

সুপ্তি তার শ্যালিকা নায়লা আর রফিকুল ইসলামের মেয়ে। রফিকুল আলম রফিকুল ইসলামের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চলে যান।

এ সময় বিমানের ভেতর একটা বাচ্চা ভীষণ কাঁদতে শুরু করে। বাচ্চাটাকে ওর মা কিছুতেই থামাতে পারে না। পরে বিমানবালারা এসে নানা রকম খেলনা টেলনা দিয়ে বাচ্চাটাকে থামান।

রফিকুল আলমের ভাবনার বানর এবার তাঁর শ্যালিকা নায়লার বাড়িতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তার মেয়ের জন্মদিনে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে সেদিন রফিকুল আলম ম্যাজিক দেখান। নায়লার বাড়িতে রফিকুল আলম সেদিন নিদ্রাসুন্দরীর বাবাকে দেখতে পান। নালিতাবাড়ী থেকে এসেছেন তিনি। তাঁকে দেখে রফিকুল আলম খুবই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। তাঁকে বলেন, 'আপনি কালকে অবশ্যই আমার সাথে একটু দেখা করবেন। আজকে তো জন্মদিন নিয়ে নানা হই-হল্লা, আজকে কথা বলা যাবে না, কালকে আপনার সাথে নিরিবিলি একটু কথা বলব।' নিদ্রাসুন্দরীর বাবা মাথা নাড়েন। রফিকুল আলম অবশেষে নিদ্রাসুন্দরী নামের রহস্য উন্মোচন করতে পারবেন ভেবে উত্তেজিত থাকেন। তারপর তিনি অনুষ্ঠানে বাচ্চাদের নাকের ভেতর থেকে জাদুর সাহায্যে খুচরা পয়সা বের করেন।

অনুষ্ঠান শেষে সবাই যাঁর যাঁর ঘরে চলে যান। ওপরের ফ্ল্যাটে রফিকুল আলম, নিচে রফিকুল ইসলাম। বিমানবালা এসে যাত্রীদের কাছে জানতে চান তাঁরা চা বা কফি খাবেন কি না। রফিকুল আলম এক কাপ চা নেন। চায়ে চুমুক দেবার সাথে সাথে তাঁর কানে সেদিনের রাতের কলবেলের শব্দটা বেজে ওঠে। জন্মদিনের অনুষ্ঠান শেষে ক্লান্ত হয়ে রাতে বিছানায় শোয়ার পর গভীর রাতে, রাত প্রায় দুইটার সময় রফিকুল আলম হঠাৎ তাঁর দরজায় কলবেল শুনতে পান। তিনি ঘুমজড়ানো চোখে উঠে দরজা খুলে দেখেন, দরজায় পুলিশ। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, কী ব্যাপার?

পুলিশ বলে : আপনাকে থানায় যেতে হবে।

কেন, রফিকুল আলম জিজ্ঞাসা করেন।

পুলিশ আপনার নামে কেস আছে।

রফিকুল আলম : কিসের কেস?

পুলিশ : রেপ কেস।

রফিকুল আলম : মানে?

পুলিশ : আপনার নিচের তলায় রফিক সাহেবের বাসায় যে কাজের মেয়ে আছে নিদ্রাসুন্দরী, তার বাবা আপনার নামে মামলা করেছে যে আপনি তার মেয়েকে রেপ করেছেন। আপনি নিচে আসেন। আমাদের ভ্যান আছে, আপনাকে থানায় যেতে হবে।

রফিকুল আলম কিছু বুঝে উঠতে পারেন না। তিনি পুলিশকে বলেন, আমি একটু রফিকের সাথে কথা বলে আসি। ব্যাপার তো আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

পুলিশ বলে, রফিক সাহেব থানায় আছেন। তাঁর স্ত্রী নায়লাকেও আমরা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অ্যারেস্ট করেছি। মিসেস নায়লার নামেও অভিযোগ আছে তিনি নিদ্রাসুন্দরীকে নানাভাবে নির্যাতন করেছেন।

ঘুম চোখে কাপড় বদলে হতভম্ব রফিকুল আলম লিফট দিয়ে নামেন। তিনি মোবাইলে ইসলামকে ফোন দেন কিন্তু ইসলাম ধরেন না। রফিকুল আলম পুলিশের ভ্যানে উঠে দেখেন, সেখানে তাঁর শ্যালিকা নায়লা আঁচলে মুখ ঢেকে বসে আছে। রফিকুল আলম তাকে জিজ্ঞাসা করেন, কী ব্যাপার এই সব, রফিক কোথায়?

নায়লা আঁচলে মুখ ঢেকেই বলে, থানায়। ওসির সাথে কথা বলতেছে।

রফিকুল আলম বলেন, নিদ্রাসুন্দরী, ওর বাবা এরা সব কই? ঘটনাটা কী?

নায়লা, ওরা সব থানায়। ঘটনা আমিও কিছু জানি না।

তাদের দুজনকে থানায় নিয়ে গিয়ে বসায় পুলিশ। রফিকুল আলম রফিকুল ইসলামকে খোঁজার চেষ্টা করেন। দেখতে পান না। তিনি রফিকুল ইসলামকে আবার ফোন করেন। কিন্তু রফিকুল ইসলাম ফোন ধরেন না। আলম ভাবেন আমেরিকায় তাঁর স্ত্রীকে ফোন দিয়ে সব জানাবেন কি না। কিন্তু এসব বলে তাঁকে খামোখা টেনশনে ফেলার কোনো মানে হয় না, এই ভেবে তিনি আর স্ত্রীকে ফোন করেন না।

কিছুক্ষণ পর পুলিশ এসে রফিকুল আলমকে বলে, আপনাকে হাজতে থাকতে হবে। কালকে সকালে সিদ্ধান্ত হবে, আপনাকে জেলে চালান করা হবে কি না।

আর নায়লাকে বলে, আপনাকে ওসির অফিসে যেতে হবে, সেখানে ওসি সাহেব আপনার সাথে কথা বলবেন।

রফিকুল আলম নায়লাকে বলেন, কী ব্যাপার, রফিক তো আমার ফোন ধরতেছে না, ব্যাপার কী? তুমি এখনই গিয়ে রফিককে বলো আমাকে ফোন দিতে।

রফিকুল আলম রফিকুল ইসলামের ফোনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। কোনো ফোন আসে না।

পুলিশ একপর্যায়ে রফিকুল আলমের মোবাইল ফোনটা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে নেয় এবং তাঁকে হাজতে পাঠায়। হাজতে আরও দুজন ছিনতাইকারীর সাথে এক বিনিদ্র, বীভৎস, ম্যাজিক্যাল রাত কাটান রফিকুল আলম। সেই রাতেই রফিকুল আলম প্রথম গভীরভাবে টের পান যে তিনি বস্তুত নেহাত একজন বেকুব এবং বলদ ম্যাজিশিয়ান। রফিকুল ইসলামের সাথে ধান্দাবাজি বন্ধ করা নিয়ে তাঁর সংলাপ, জন্মদিনের অনুষ্ঠানে নিদ্রাসুন্দরীর বাবার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উপস্থিতি, রফিকুল ইসলামের ফোন না ধরা ইত্যাদির অঙ্ক ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর কাছে। রফিকুল আলমের কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয় এসবই রফিকুল ইসলামের আয়োজন। সে জানে পুলিশের সঙ্গে রফিকুল ইসলামের গভীর যোগাযোগ আছে। তাকে সবচেয়ে চমৎকৃত করে ব্যাপারকে সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখার কৌশল হিসেবে তাঁর সঙ্গে নায়লাকেও গ্রেপ্তার করানোর অতীব সৃজনশীল পদক্ষেপে। রফিকুল আলমের কাছে খোলাসা হয় যে তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্যই এ নিপুণ আয়োজন করেছে ইসলাম। রফিকুল আলম অনুভব করেন, এই ঘটনার পর গভীর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছেন তিনি। তিনি সেই নির্ঘুম রাতে গভীরভাবে টের পান যে জগৎ-সংসার অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ল অব থার্মোডিনামিকস, ম্যাজিক এই সবের জ্ঞানে চলে না। চলে অন্য জ্ঞানে। যে জ্ঞান রফিকুল আলমের কানাকড়িও নাই।

পরদিন সকালে কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই তাঁকে হাজত থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। রফিকুল আলম টের পান, এটাও নাটকের পূর্বনির্ধারিত দৃশ্য। হাজত থেকে বেরিয়ে তাঁর মোবাইল ফোনটা হাতে পেয়ে নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত রফিকুল আলম প্রথম আর কাউকে না তাঁর পরিচিত সেই ট্রাভেল এজেন্টের ম্যানেজারকে ফোন দেন। ফোন দিয়ে এই প্রথমবারের মতো তাঁকে বলেন আমেরিকার একটা ওয়ানওয়ে টিকিট কাটতে।

পাইলট এ সময় ঘোষণা দেন প্লেন কিছুক্ষণের মধ্যেই দুবাই বিমানবন্দরের দিকে নামতে শুরু করবে। রফিকুল আলম সিটবেল্ট বেঁধে নেন। দুবাইতেই তিনি প্লেন পাল্টে আমেরিকার সেই বিখ্যাত শহরের প্লেন ধরবেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লবঙ্গের বঙ্গ ফেলে

একটা কালো ছাগলের পিঠের ওপর একটা কালো শালিক। এই দৃশ্য পৃথিবীর ভেতর রচিত হয়ে আছে। ছাগলের মুখ উত্তর দিগন্তের দিকে আর শালিকের মুখ দক্ষিণে। পৃথিবীর যে পৃষ্ঠে এই দৃশ্য রচিত হয়েছে, তার নাম সত্রাসিয়া। সত্রাসিয়ায় প্রতি বুধবার হাট বসে। আজ হাটবার নয়। বিরান হাটে কালো ছাগল তার পিঠে এক কালো শালিক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদিও সেই ছাগলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত, কারণ তার গলায় মালার মতো জড়িয়ে আছে দড়ি, যে দড়ি একটা কাঠের টুকরাসহযোগে মাটিতে প্রোথিত।

সন্ধ্যা নামলে কালো ছাগলকে তার খুঁটি থেকে মুক্ত করে বাড়িতে নিয়ে যায় যে নারী, তাকে দেখলে ভাবা যেতে পারে যে সে আর জনমে হরিণ ছিল। চাঞ্চল্য এবং মায়া মিলিয়ে একটা ঘোর তৈরিতে সে পারঙ্গম।

এই নারীকে গ্রামের লোকেরা ছক্কা বেটি বলে ডাকে।

কোনো কোনো দিন সন্ধ্যা নামলে গ্রামের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কুপি জ্বালিয়ে এই হরিণ নারী লুডু খেলে। লুডুর দানে ছক্কা পড়লে এই নারী উত্তেজনায় চিৎকার করে ওঠে 'ছক্কা আআআ' তার এই উত্তেজিত চিৎকার পেছনের বাঁশঝাড় পেরিয়ে দূর দূর বাড়ি থেকেও শোনা যায়। ছক্কা বেটি নামটির উৎস এই বলেই ধারণা করা যায়

তবে এই নারীর প্রকৃত নাম নার্গিস পারভীন।

প্রতিদিন কালো ছাগলটিকে মমতায় বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গেলেও আজ নার্গিস পারভীনকে দেখা যাচ্ছে না। কালো ছাগলটা তার পিঠে এক কালো শালিক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

২

মোজাম্মেল আলী কাঁঠাল ভালোবাসেন। শজারুসদৃশ এই জটিল ফল মোজাম্মেল আলীর প্রিয়। কাঁঠাল খেতে তিনি পছন্দ করেন না। তবু কাঁঠাল তাঁর প্রিয়, কারণ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই ফল তাঁর সহায়-সম্পত্তির উৎস। বংশপরম্পরায় সত্রাসিয়ার সবচেয়ে বড় কাঁঠালবাগানের মালিক তিনি। এই পৃথিবীতে কাঁঠাল দেখছেন তিনি ষাট বছর ধরে। ধারণা করা যায়, জন্মের পর থেকেই তিনি কাঁঠাল দেখছেন। কারণ, তাঁর বাবাও এই কাঁঠালের ব্যবসাই করতেন। তাঁদের বাড়ির আনাচকানাচে স্তূপীকৃত অথবা নিঃসঙ্গ কোনো কাঁঠাল পড়ে থাকতে দেখা যেত। ফলে ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই তাঁর চোখে কাঁঠাল পড়বার কথা। যদিও এটা যে কাঁঠাল সে বোধ জন্মাতে নিশ্চয় তাঁর দীর্ঘ সময় লেগেছে। ভূমিষ্ঠ হয়ে তিনি এই বিচিত্র ফল দেখছেন। এর ঘ্রাণ পাচ্ছেন। গ্রীষ্মকালেই জন্ম হয়েছিল তাঁর এবং এ সময় তাঁদের বাড়ি কাঁঠাল গন্ধময় হয়ে থাকে। তারপর ষাট বছর পেরিয়ে গেছে। মোজাম্মেল আলী এই কাঁঠালের পৃথিবীতেই রয়ে গেছেন। হাতের তালুতে কাঁঠাল নিয়ে তিনি টের পেতেন এর ভেতরের গুণাবলি। কিছু কাঁঠালের কোয়া অতীব নরম। পাকলে সেই কোয়া চেপে রসপ্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব। সেই সব কাঁঠালের কোয়া দুধসহ খাওয়ার উপযোগী। আবার কিছু কাঁঠাল আছে যার কোয়া থেকে রসপ্রবাহ সৃষ্টি করা দুরূহ। এগুলো শক্ত। পাকলেও তারা শক্ত, যদিও তা যথেষ্ট মিষ্টি। এই সব কাঠাল দাঁত দিয়ে চিবানোর সময় কচকচ শব্দ হয়ে থাকে। এই বিবিধ জাতের কাঁঠাল মোজাম্মেল আলী হাতের তালুতে নিয়েই শনাক্ত করতে পারতেন। হাতে নিয়েই বলে দিতে পারতেন ভেতরের কী স্বভাব। কিছু কাঁঠালের আকার প্রকাণ্ড হওয়াতে সেগুলোকে দুহাত দিয়ে তুলতে হতো। এই সব বিগত দিনের কথা। বয়সের ভারে এখন একটা প্রমাণ সাইজের কাঁঠাল তিনি হাতের তালুতে অথবা দুহাতে কোনোভাবেই আর আলগাতে পারেন না।

৩

মোজাম্মেল আলীর এই কাঁঠালময় দীর্ঘ জীবনে সম্প্রতি শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কারণ, তাঁর স্ত্রী সুফিয়া খাতুন মৃত্যুবরণ করেছেন। সুফিয়া খাতুন ভালো মাষকলাইয়ের ডাল রান্না করতেন। মোজাম্মেল আলী কাঁঠাল বিশেষ পছন্দ না করলেও মাষকলাইয়ের ডাল খুব পছন্দ করতেন। তিনি মনে করতেন, সুফিয়া খাতুন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মাষকলাইয়ের ডাল রান্না করেন। কালচে ধরনের এই ডাল রান্নার পর খানিকটা আঠালো ধরনের হয়ে ওঠে। সুফিয়া খাতুনের নানা মসলার রসায়নে সেই ডাল হয়ে ওঠে অনন্য। অন্যবিধ রান্নার ক্ষেত্রে সুফিয়া খাতুন তাঁর রান্নার সহযোগী মোতির মায়ের সাহায্য নিলেও মাষকলাইয়ের ডাল তিনি নিজের হাতে বরাবর রান্না করে থাকেন। সেই ডাল তিনি নিজের হাতে মোজাম্মেল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আলীর পাতে তুলে দিয়ে প্রভূত আনন্দ পেতেন। মোজাম্মেল আলী এক থালা খেয়ে বলতেন, 'আরেক চামুচ দেও ছে।' তারপর তিনি আঙুল দিয়ে কাঁসার থালা চারিদিকে চেঁছে থালাটাকে পরিষ্কার ক্যানভাস বানিয়ে তুলতেন। খাওয়ার পর তাঁর মেন্দি দেওয়া দাড়িতে একটু-আধটু মাষকলাইয়ের ডাল লেগে থাকত। গামছা দিয়ে তা মুছে নিতেন তিনি। বৃদ্ধ বয়সে মোজাম্মেল আলী কাঁঠাল আগের মতো আলগাতে না পারলেও সুফিয়া খাতুনের মাষকলাইয়ের ডাল রান্নার প্রতিভা বৃদ্ধ বয়সেও এতটুকু ক্ষুণ্ন হয়নি। এই মাষকলাইয়ের ডাল রান্না করতে করতে চুলার পাশেই বৃদ্ধা সুফিয়া খাতুন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। মোজাম্মেল আলী তখন হাটে ছিলেন। বাড়ির লোকেরা সুফিয়া খাতুনকে হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং মোজাম্মেল আলী সেখানে গিয়েই জানতে পারেন, সুফিয়া খাতুন বস্তুত হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন।

৪

মোজাম্মেল আলীর সত্রাসিয়া বাড়ির উঠান বিষাদগ্রস্ত। কাছের মহিমাগঞ্জ শহর থেকে তাঁর একমাত্র মেয়ে রেহানা সারা পথ কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসেছে সত্রাসিয়ায়। সঙ্গে রেহানার স্বামী মহিমাগঞ্জ হাইস্কুলের অঙ্ক শিক্ষক রুহুল আমিন। রেহানা বাবা মোজাম্মেল আলীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে। মোজাম্মেল আলী স্তব্ধ হয়ে থাকেন। মোজাম্মেল আলীর ব্যবসা দেখাশোনা করে বোরহানুদ্দিন। মোজাম্মেল আলী স্তব্ধ এবং রেহানা শোকাকুল থাকার কারণে বোরহানুদ্দিনকে দেখা যায় তৎপর হয়ে সুফিয়া খাতুনের মৃত্যু-পরবর্তী আনুষ্ঠানিকতার দায়িত্ব নিতে। একপর্যায়ে বাড়ির উঠানে স্তূপীকৃত কাঁঠালের গায়ে হেলান দিয়ে একাকী উদাস বসে থাকেন মোজাম্মেল হক তাঁর গেঞ্জি এবং তা ভেদ করে পিঠের চামড়ায় দেখা দেয় কাঁঠালের কাঁটার দাগ। দাফনের ব্যবস্থাপনায় বোরহানুদ্দিনের সাথে যোগ দেয় রেহানার স্বামী অঙ্কের শিক্ষক রুহুল আমিন। কাঁঠালবাগান পেরিয়ে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয় সুফিয়া খাতুনকে। শেষকৃত্য সম্পন্ন হলে স্কুলের ক্লাস নেবার প্রয়োজনে রুহুল আমিন ফিরে যায় মহিমাগঞ্জ শহরে। রেহানা সিদ্ধান্ত নেয় বাবার শোক কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে বলে তার পাশে সে থেকে যাবে আরও কিছুদিন। মোজাম্মেল আলী ব্লাড প্রেশারের রোগী। তাঁকে নিয়মিত অনেকগুলো ওষুধ খেতে হয়। এই ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারটা দেখাশোনা করতেন সুফিয়া খাতুন। সময়মতো এক গ্লাস পানি আর নির্দিষ্ট ওষুধটা নিয়ে তিনি হাজির হতেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মোজাম্মেল আলীর সামনে। রেহানা বাবার পাশে থেকে যান যাতে তাঁর ওষুধ খাওয়ার কোনো গাফিলতি না হয় এই ভেবে। সেই সুবাদে সে কাজের মেয়ে মোতির মাকেও এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিয়ে রাখতে চায়। রেহানা তার মেয়ে জুঁইকে নিয়ে সত্রাসিয়ায় থেকে যায় সুফিয়া খাতুনের কুলখানি পেরিয়ে চল্লিশা পর্যন্ত। মোতির মাকে সঙ্গে নিয়ে বাবার জন্য ভালো-মন্দ রান্না করে। মোজাম্মেল আলী ধীরে ধীরে স্ত্রীর মৃত্যুর শোক কাটিয়ে ওঠেন। মনোযোগ দেন কাঁঠাল ব্যবসায়। রেহানা ফিরে যায় মহিমাগঞ্জে। তবে সুযোগ পেলেই চলে আসে সত্রাসিয়ায়, বাবার জন্য রান্না করে মাষকলাইয়ের ডাল। রেহানার মাষকলাইয়ের ডাল রান্নার প্রতিভা তার মায়ের মতো নয়, তবু মোজাম্মেল আলী মেয়ের রান্নার ভেতরই খুঁজে নেন সেই হারানো স্বাদ।

৫

ঘটনায় নৈমিত্তিকতার মোড় ঘোরান হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মোহাম্মদ বরকত। হাটের দিন সব কাজ শেষে রাতে বাড়ি ফেরার আগে কিছু সময় ডাক্তার মোহাম্মদ বরকতের চেম্বারে বসে আড্ডা দেওয়া মোজাম্মেল আলীর অনেক দিনের অভ্যাস। ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাবার ফলে মেয়ে রেহানার চাপে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খেলেও নানা অসুখ-বিসুখে মোজাম্মেল আলী বরাবর ডা. মোহাম্মদ বরকতের হোমিওপ্যাথিক ওষুধই খেয়েছেন। চেম্বারে গল্প করার এক ফাঁকে ডাক্তার মোহাম্মদ বরকত প্রস্তাবটা রাখেন মোজাম্মেল আলীর কাছে। তিনি বলেন, 'একা একা আর কদ্দিন থাকবাইন? আপনের সেবাযত্নের একজন মানুষ লাগে না?' মোহাম্মদ বরকত এই মত প্রতিষ্ঠা করতে চান যে এই বার্ধক্যে মোজাম্মেল আলীর এভাবে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন সমীচীন না। সমাধান একটাই, বিয়ে করে ফেলা মোজাম্মেল আলী এ ধরনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। ডা. বরকত বলেন, 'আইচ্ছা, আরও ভাবুইন যে।'

চেম্বারের পরবর্তী আড্ডায় মোহাম্মদ বরকত আবার সেই একই আলাপ তোলেন। দেখা যায় মোজাম্মেল আলীর প্রতিবাদের জোর খানিকটা কমে এসেছে এবার। মোহাম্মদ বরকত জানান, পাত্রী তাঁর হাতেই আছে। দূরের রোহনপুর গ্রামের এক মেয়ে। তাঁরই এক আত্মীয়ের মেয়ে সে। বিয়ে হয়েছিল মেয়েটার কিন্তু বিয়ে ভেঙে গেছে। বিয়ের তিন বছর পরও মেয়েটা সন্তানধারণে সক্ষম হয়নি বলে স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে। এখন সে তার বাবা-মায়ের বাড়িতেই থাকে। ডা. বরকত এই মেয়েটাকে বিয়ে করার পক্ষে নানা যুক্তি দেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মোজাম্মেল আলীর কাছে। ডা. বরকত বলেন, মোজাম্মেল আলীর তো সন্তানের কোনো দরকার নাই, দরকার সেবাযত্ন। তিনি এ-ও জানিয়ে রাখেন যে মেয়েটার সঙ্গে তাঁর বয়সের পার্থক্য হবে বিস্তর, হয়তো ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ বছর, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না বলেই তিনি মত রাখেন। বরং বলেন মোজাম্মেল আলীর সংসার, কাঁঠালের ব্যবসা এসব দেখাশোনার জন্য তাঁর পাশে একজন শক্ত সামর্থ্য কেউ থাকাই জরুরি। তা ছাড়া মেয়েটা এখন তার বাবা-মায়ের গলগ্রহ হয়ে বাড়িতে বসে আছে। ডা. বরকত বোঝান যে মেয়েটাকে বিয়ে করলে দুপক্ষেরই জয়। ডা. বরকতের কথা শুনতে শুনতে মোজাম্মেল আলী তাঁর মেন্দি দেওয়া দাড়িতে হাত বোলান। কিছু বলেন না।

চেম্বারে এর পরের আড্ডায় ডা. মোহাম্মদ বরকত মোজাম্মেল আলীকে সেই মেয়েটার ছবি দেখান। তাজমহলের ছবির প্রেক্ষাপটে স্টুডিওতে তোলা সেই ছবিতে দেখা যায় চুল খোলা এক তরুণী। ডাক্তার মোহাম্মদ বরকত বলেন, এই মেয়ের নাম নার্গিস পারভীন। মোজাম্মেল আলী ছবিটা হাতে নেন। উল্টেপাল্টে দেখেন। এবারও তাঁর মেন্দি দেওয়া লালচে দাড়ির ওপর মৃদু আঙুল বোলান। কোনো কথা বলেন না।

৬

মোজাম্মেল আলীর সাথে নার্গিস পারভীনের বিয়ের ব্যবস্থা হয়। মোজাম্মেল আলী তাঁর মেয়ে রেহানাকে এ খবর জানালে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে পড়ে রেহানা। বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদে। রুহুল আমিন বিছানায় বসে রেহানার মাথায় হাত বোলায়। রেহানা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে আর বলে, 'আব্বা কেমনে পারল? কেমনে পারল আব্বা?'

রুহুল আমিন সান্ত্বনা দেয়, 'কী আর করবা বয়স হইছে, একজন কাছে থাকলে তো ভালোই।'

রেহানা চুপ থাকে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায় এবং রুহুলকে জানায় যে সে আর কোনো দিন সত্রাসিয়া যাবে না। প্রয়োজন হলে রুহুল যেন জুঁইকে নিয়ে তার নানার সাথে দেখা করে।

৭

বিয়ের বিশেষ কোনো আয়োজন হয় না। নার্গিস পারভীনের বাবা, মা এবং এক ভাই রোহনপুর গ্রাম থেকে আসেন। প্রথমে বাসে, তারপর নছিমনে চেপে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সত্রাসিয়ায় মোজাম্মেল আলীর বাড়িতে আসেন তাঁরা। মোজাম্মেল আলী তাঁর পরিচিত কিছু মানুষ এবং গ্রামের গণ্যমান্য কতিপয় মানুষকে দাওয়াত দেন। আসতে বলেন কাজিকে। বিয়ের খাওয়া ইত্যাদি আয়োজন করে বোরহানুদ্দিন। প্রতিবেশী কয়েকজন মহিলা লাল শাড়ি পরা নার্গিস পারভীনকে পাশের ঘরে নিয়ে বসায়। তারা মুখ টিপে হাসে। নার্গিস পারভীন নিজেই তার ঘোমটা সরিয়ে হাস্যরত মহিলাদের দেখে। গ্রামের মহিলারা নার্গিসের সপ্রতিভ আচরণে 'ও মারে মা' বলে বিস্ময় প্রকাশ করে। নার্গিস পারভীনের সপ্রতিভ আচরণ এবং তার তারুণ্য তাদের বিভ্রান্ত করে। শিশু, বালক-বালিকারা বিশেষ কৌতূহলে চারপাশে ছোটাছুটি করে। একসময় কাজির সামনে মোজাম্মেল আলী টুপি মাথায় দিয়ে কবুল বলেন। কোলের দিক তাকিয়ে নয়, চোখ তুলেই নার্গিস পারভীন দ্বিধাহীনভাবে বলে 'কবুল'। অনাড়ম্বর বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে নার্গিস পারভীনের বাবা-মা ফিরে যান রোহনপুরের দিকে। অতিথিরা চলে যায় যে যার মতো। খাওয়া-রান্না তদার কি করে বোরহানুদ্দিন। বাবুর্চিকে টাকাপয়সা দিয়ে বিদায় করবার পর সে মোজাম্মেল আলীর সামনে দাঁড়ায়। সবাই চলে গেলেও মোজাম্মেল আলী তখন উঠানের চেয়ারে বসে দাঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে ডাক্তার মোহাম্মদ বরকতের সাথে কথা বলেন। ভেতরের ঘরে প্রতিবেশী হালিমা বেগম গল্প করেন নার্গিস পারভীনের সঙ্গে ।

বোরহানুদ্দিন বলে, মিয়া ভাই আর কিছু লাগত নি?

মোজাম্মেল আলী জানান—না, আর কিছু লাগবে না এবং তাকে বাড়ি যেতে বলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত উঠানে রাখা দুইটা চেয়ারে বসে মোজাম্মেল আলী আর মোহাম্মদ বরকত পান খান এবং গল্প করেন। একসময় ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন হালিমা বেগম, 'ভাইজান যাই তাইলে। বউ তো মাশা আল্লাহ খুব সুন্দর, ভালো মাইয়া।' ডাক্তার বরকতও তারপর বিদায় নেন।

মোজাম্মেল আলী এরপর ঢোকেন ভেতরের ঘরে।

৮

হালিমা বেগমের ঘর মোজাম্মেল আলীর ঘরের লাগোয়াই। টিনের চালের ওপার থেকে অনেক রাত পর্যন্ত মোজাম্মেল আলী এবং নার্গিস পারভীনের ফিসফাস আলাপ শোনেন তিনি। রাত গভীর হলে টিনের চাল ভেদ করে নার্গিস পারভীনের হাসির আওয়াজ শোনা যায়। হাসি চলে, থামে এবং আবার শুরু হয়। হালিমা বেগমের মনে হয় মোজাম্মেল আলী নার্গিস পারভীনকে কাতুকুতু দিচ্ছেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হালিমা বেগম মুখে বিরক্তি, বিস্ময় এবং হাসি নিয়ে ধীরে ঘুমিয়ে পড়েন।

সকালে উঠে দেখা যায় নার্গিস পারভীন কুয়াতলা থেকে গোসল করে ভেজা শাড়ি দড়িতে নেড়ে দিচ্ছে। তারপর সে তার চুলে বেঁধে রাখা গামছাটি খুলে পিঠ বাঁকিয়ে গামছা দিয়ে সেই চুল ঝাড়তে থাকে। বাতাসে তার দেহ ধনুকের মতো বাঁকিয়ে পাশের বাড়ির হালিমা বেগমকে চুল ঝাড়তে ঝাড়তেই জিজ্ঞাসা করে, 'আপনের ডিশ আছে না? রাইতে "পুন্নিপুকুর" দেখা যাইতো না?'

৯

শুধু হালিমা বেগম নয়, মোজাম্মেল আলীর অন্য প্রতিবেশীরাও খানিকটা বিরক্তি আর অনেকটা বিস্ময় নিয়ে নার্গিস পারভীনের সপ্রতিভ আচরণ দেখে।

বিয়ের কদিন পরেই নার্গিস পারভীন উচ্চ স্বরেই মোজাম্মেল আলীকে বলে, 'আমনে আর কোনো ব্যবসা পাইলাইন না? বাড়িসুদ্ধা তো খালি কাঁঠাল আর কাঁঠাল। জিন্দেগিতে এত কাঁঠাল দেখি নাই। কাঁঠালের গন্ধে তো ঘুমানি দায়।'

মোজাম্মেল আলী কিছু বলেন না। হাসেনও না। শুধু তাঁর মেন্দি দেওয়া দাড়িতে হাত বোলান।

নার্গিস পারভীন নতুন গ্রাম, নতুন বাড়িতে নতুন বউ হিসেবে আসবার পর থেকেই নিঃসংকোচে এবাড়ি-ওবাড়ি যায়, হালিমা বেগমের বাড়িতে রাতে পুন্নিপুকুর নামের সিরিয়াল দেখে, গ্রামে শিশুদের নিয়ে লুডু খেলে। শিশুদের সাথেই তার সখ্য। লুডুতে ছক্কার দান পড়লে চিৎকার করে বলে 'ছক্কা আআআ...'। তার চলাফেরায় হরিণের চাঞ্চল্য। মনে হতে পারে আর জনমে সে হরিণ ছিল।

প্রতিবেশীরা আড়ালে-আবডালে কানাঘুষা করে, 'বাঙ্গি মাইয়া তো, তাই লাজ-শরম নাই।'

গ্রামের নারীরা তাকে একরকম এড়িয়ে চলে নিঃসঙ্গ নার্গিস পারভীনের বন্ধু হয়ে ওঠে মোজাম্মেল আলীর একটা কালো ছাগল। ছাগলটাকে মাঠে নিয়ে খুঁটি দিয়ে পুঁতে আসে সে। সন্ধ্যায় নিয়ে আসে সাথে করে। মাঠ থেকে আসতে আসতে ছাগলের সাথে গল্প করে নার্গিস পারভীন। ছাগলকে বলে, ছাগল রে, একটা গল্প শুনবি?

ছাগল কিছুক্ষণ নীরব থেকে ডাকে ব্যা...

নার্গিস পারভীন বলে, 'এক দ্যাশে আছিল এক রানি। রানির খুব শখ হইলো লাউগাছ লাগাইব। রানি হের উঠানে লাগাইল লাউয়ের বিচি। বিচি থেইকা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাইর হইল দুইটা পাতা। তারপর বাইর হইল চাইরটা পাতা তারপর আটটা পাতা। যেদিন আটটা পাতা বাইর হইল, সেদিন ওই লাউগাছরে চিবাইয়া খাইয়া ফেলল তোর মতো এক কাউলা ছাগল। রানির সেই কী কান্দন।'

বলে নিজেই হো হো করে হাসে সে। ছাগলকে বলে, হুনলি গল্প?

ছাগল কোনো উচ্চবাচ্য করে না। নীরবে নার্গিস পারভীনের পাশ দিয়ে হাঁটে। তার মনে হয় ছাগল সম্ভবত অপমানিত বোধ করেছে। সে ছাগলকে আদর করে বলে, মন খারাপ করছস। তোরে কই নাই তো?

১০

বিয়ের পর মাস পেরিয়ে গেলেও মোজাম্মেল আলীর মেয়ে রেহানা তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করে না। তবে গোপনে সত্রাসিয়ার লোক পাঠিয়ে খোঁজখবর নেয়। তার বাবার নতুন স্ত্রী নার্গিস পারভীনের নানা কাণ্ড-কারখানা সম্পর্কে জানতে পারে। লোকেরা তাকে বলে মোজাম্মেল আলীর নতুন স্ত্রীর সম্ভবত মাথায় ছিট আছে। রেহানা আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় সে আর কখনো সত্রাসিয়ামুখী হবে না। কিন্তু বাবার জন্য মন কাঁদে তার। সে তার স্বামী মহিমাগঞ্জ স্কুলের শিক্ষক রুহুল আমিনকে বলে, 'তুমি আব্বারে দেইখা আসো একবার। ওই শয়তান মাইয়া আমার বাপরে মাইরা সম্পত্তি দখলের ধান্দায় আছে।'

এক ছুটির দিনে স্বামী রুহুল আমিনকে সত্রাসিয়ার পাঠায় রেহানা। বাবার জন্য ব্লাড প্রেশারের ওষুধ কিনে একটা ছোট ব্যাগে ভরে দেয়। নিজে হাতে মাষকলাইয়ের ডাল রান্না করে একটা পাতিলে সুন্দর করে বেঁধে দেয়। পাতিলটার মুখ পলিথিন আর দড়ি দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে চোখের পানি আর নাকের পানি এক করে কাঁদে সে। রুহুল আমিনকে বলে, 'আব্বারে কইয়ো জুঁইয়ের জন্য দোয়া করতে।'

রুহুল আমিন রেহানার মমতা মাখানো মাষকলাইয়ের ডালের পাতিল নিয়ে সত্রাসিয়া রওনা দেয়।

১১

মোজাম্মেল আলীর বাড়ির উঠানে গিয়ে দাঁড়ালে রুহুল আমিন নার্গিস পারভীনকে দেখতে পায়। রান্নাঘরের দিকে যেতে নিয়ে রুহুল আমিনকে উঠানে ঢুকতে দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে নার্গিস পারভীন বলে, আমনে কে?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি রুহুল, রেহানার স্বামী—বলে মাষকলাইয়ের ডালের পাতিলটা হাত বদল করে রুহুল।

নার্গিস পারভীন হেসে ওঠে, আল্লা কয় কী? রেহানা আসে নাই? এই যে হুনছেন...বলে নার্গিস পারভীন উঠান পেরিয়ে ভেতরের ঘরে মোজাম্মেল আলীকে ডাকতে যায়।

রুহুল পেছন থেকে নার্গিস পারভীনকে দেখে। হেঁটে যাওয়া নার্গিস পারভীনের মাথা থেকে কোমর অবধি সরলরেখার মতো সটান পিঠ। পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়া চুল। আর কোমরের নিচ থেকে তার শরীর উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে উথালপাতাল করে।

কিছুদূর হেঁটেই আবার ফিরে আসে নার্গিস পারভীন, ভুইলাই গেছি। আপনার আব্বা তো বাড়িত নাই, হাটে গেছে।

নার্গিস পারভীন একটা চেয়ার এনে উঠানে রাখে, বলে, বসেন বসেন।

এ সময় বোরহানুদ্দিন এসে হইচই করে ওঠে, আরে রুহুল ভাই, কদ্দিন পরে আইলেন। আফায় আহে নাই ক্যান...ইত্যাদি বলতে থাকে। বোরহানুদ্দিন আরও জানায় মোজাম্মেল আলী হাট থেকে গেছেন জেলা শহরে, ফিরতে ফিরতে কখন হয় বলা মুশকিল।

নার্গিস পারভীন বলে, আইচ্ছা, রাখো তুমি বোরহান। একটা মুরগি জবাই দ্যাও, রান্না করি। রুহুল আপনে হাতমুখ ধুইয়া নেন, খাওয়াদাওয়া করেন, আপনের আব্বা চইলা আসবে।

বোরহান মুরগি জবাই করে। রুহুল আমিন হাতমুখ ধোয়। উঠানোর পাশে ছাদ আর চারিদিক খোলা রান্নাঘরে নার্গিস পারভীন চুলায় কষানো মুরগির মাংস রান্না করে। চারিদিকে মসলার গন্ধ ছড়িয়ে থাকে নার্গিস রুহুল আমিনকে বলে চেয়ার এনে চুলার পাশে বসতে বলে, সম্পর্কে আপনারে আমি আপনে ডাকতে পারি, না তুমি ডাকি?

রুহুল বলে, তাই তো, তুমিই তো ডাকবেন

নার্গিস পারভীন রুহুলকে তাদের মেয়ে জুঁইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করে। বলে, মোজাম্মেল আলী তাঁর নাতি জুঁইয়ের গল্প তাকে করেছে। নার্গিস পারভীন বলে সে বুঝেছে কেন রেহানা আসেনি। বলে রেহানা, জুঁইকে নিয়ে রুহুল যেন ভবিষ্যতে আসে। বলে, 'রেহানারে বইলো আমি মানুষ খারাপ না।'

এক ফাঁকে হালিমা খাতুন এসে রেহানা আর জুঁইয়ের খোঁজ নিয়ে যায়।

রুহুল রান্নাঘরের পাশে তার তরুণী শাশুড়ির সঙ্গে গল্প করে। রান্না শেষ হয়, তবু মোজাম্মেল আলী ফেরে না। নার্গিস পারভীন রুহুলের জন্য খাবার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বেড়ে দেয়। রুহুলকে বাতাস করে। রুহুল তাকেও খেতে বললে নার্গিস মোজাম্মেল আলীর জন্য অপেক্ষা করবে বলে জানায়। রুহুলকে মুরগির মাংসের সাথে রেহানার পাঠানো মাষকলাইয়ের ডালও বেড়ে দেয় নার্গিস পারভীন।

রুহুলের খাওয়া শেষ হলে তাকে পান খেতে দেয় নার্গিস পারভীন। তাদের গল্প চলতে থাকে। মোজাম্মেল আলী আসে না। নার্গিস পারভীন বলে, তোমার শ্বশুররে কি খাইছে জানো?

রুহুল : কী?

নার্গিস পারভীন : তোমারে একটা শোলক কই, ভাঙ্গাইতে পারো নাকি দেহো তো।

রুহুল : কন দেখি।

নার্গিস, 'কামারের মার মাইরা, পাঁঠার কাইট্টা পা, লবঙ্গের বঙ্গ ফেইলা চুইষা চুইষা খা', কও তো এইটা কী?

রুহুল : কিছু তো বুঝলাম না।

নার্গিস : বুঝলা না তো? তাইলে ভাঙ্গাইয়া দেই। ধরো, কামারের মার মাইরা দিলে কী থাকে? কা। পাঁঠার পা কাইট্টা দিলে কী থাকে? ঠা। এরপর ধরো লবঙ্গের বঙ্গ ফালাইয়া দিলে কী থাকে? ল। তাইলে কী হইল? কাঁ ঠা ল। তোমার আব্বারে খাইছে ওই কাঁঠালই।

রুহুল আমিন মহা আমোদে হাসে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে, মোজাম্মেল আলী আসেন না।

১২

মোজাম্মেল আলীর সাথে দেখা না করেই চলে আসে রুহুল আমিন। বিমর্ষ হয় রেহানা। মানা করা সত্ত্বেও এতটা সময় বাবার নতুন স্ত্রীর সাথে রুহুল গল্প করেছে শুনে ক্ষিপ্ত হয় রেহানা, কী অত কথা ওই শয়তান মাইয়াটার সাথে?

সপ্তাহখানেক পরে রেহানা আবার রুহুলকে সত্রাসিয়ায় পাঠায়। বলে আব্বার সাথে দেখা না কইরা আসবা না। বলে, 'আব্বারে বলবা আমার সাথে তার আর দেখা হবে না। আব্বা যেন আমার বাড়িতে না আসে।' এবারও রেহানা মাষকলাইয়ের ডাল রান্না করে দেয় তার বাবার জন্য। বলে, আব্বা না থাকলে হাটে ঘুইরা আইসো। এই মাইয়ার সাথে কথা কইয়ো না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রুহুল আমিন আবার সত্রাসিয়া যায়, তার সঙ্গে থাকে মাষকলাইয়ের ডালের হাঁড়ি। এবার মোজাম্মেল আলীর সাথে দেখা করে সে। মোজাম্মেল আলীর মেয়ে রেহানা আর নাতনি জুঁইকে দেখতে চায়। তাঁর চোখ সিক্ত হয়ে ওঠে। নার্গিস পারভীনের সাথেও কথা বলে রুহুল আমিন।

এভাবে নিয়মিত রেহানার বদলে রুহুল মহিমাগঞ্জ থেকে যায় সত্রাসিয়ায় মোজাম্মেল আলীর সাথে দেখা করতে। মোজাম্মেল আলী রেহানার জন্য কাঁদেন। বলেন, 'মেয়েরে কইও আমারে মাফ কইরা দিতে। তবু একবার তার মুখ, নাতির মুখ য্যান দেখাইয়া যায়।'

রুহুল আমিন এভাবে মাষকলাইয়ের ডালবাহক হিসেবে সত্রাসিয়ায় যায় এবং মোজাম্মেল আলীর কান্নার গল্প সঙ্গে করে নিয়ে আসে মহিমাগঞ্জ। এভাবেই চলতে থাকে মাসের পর মাস।

একসময় নিজেই বলে, যাই, একটু আব্বারে দেইখা আসি। তারপর সত্রাসিয়ায় যায়। তবে যেদিন মোজাম্মেল আলী বাড়ি থাকেন না, রুহুল রেহানার কথামতো সেদিন হাটে না গিয়ে বরং বাড়িতে বসেই নার্গিস পারভীনের হাতের পান খায়।

১৩

এরপর কোনো এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় আকস্মিক সত্রাসিয়া এবং মহিমাগঞ্জে দুটো দৃশ্যের জন্ম হয়।

সেদিন সন্ধ্যায় সত্রাসিয়ার মাঠে সেই কালো ছাগলকে একটা কালো শালিককে পিঠে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। একসময় শালিক পাখি তার পিঠ থেকে উড়ে অন্য গন্তব্যে চলে যায়, সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামে তবু জ্যোৎস্নালোকে একা একা সেই ছাগল ঘুরে বেড়ায়। সেই ছাগলকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে কেউ আসে না। একাকী ছাগল অন্ধকারে খুঁটির চারপাশে ঘোরে।

অন্যদিকে সেদিন রাতে মহিমাগঞ্জে রুহুল আমিনের বাড়ির পেছনে পুকুরের মাঝ বরাবর নানা সবুজ জলজ শৈবালের ভেতর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ভেসে আছে এক হলুদ লাল ছাপা শাড়ি। পুকুরের চারপাশে অনেক মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নালোকে সেই হলুদ শাড়ির ভেতর জড়িয়ে থাকা একটি মৃতদেহ পর্যবেক্ষণ করে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৪

সেদিন ভোরে রুহুল আমিন সত্রাসিয়ায় গিয়েছিল। মহিমাগঞ্জে ফিরে আসার কথা ছিল দুপুরের ভেতরেই। রুহুল আমিন ফেরেনি। কুপি জ্বালিয়ে অপেক্ষা করেছে রেহানা। খায়নি। জুঁই ক্লান্ত হয়ে বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছে। রেহানা উঠানে বসে থেকেছে অন্ধকার পথের দিকে তাকিয়ে। তারপর অনেক রাতে এক প্রতিবেশী এসে তাকে বলে রুহুল আর আসবে না। কারণ, তারা খোঁজ পেয়েছে, রুহুল আমিন সত্রাসিয়া গিয়ে মোজাম্মেল আলীর স্ত্রী নার্গিস পারভীনকে নিয়ে পালিয়ে চলে গেছে অন্য এক শহরে।

১৫

দুজন যুবক সাঁতরে মহিমাগঞ্জে রুহুল আমিনের বাড়ির পেছনের পুকুরের মাঝ থেকে মৃতদেহ টেনে তীরের দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে সকলের জানা হয়ে গেছে যে মৃতদেহটি রেহানার। নানা জলজ লতাগুল্মের ভেতর রেহানার হলুদ লাল শাড়ি আটকে যেতে থাকে। সাঁতারু যুবকেরা লতাগুল্ম থেকে শাড়ির জট খোলার চেষ্টা করে। গ্রামের লোকেরা জ্যোৎস্নাপ্লুত পুকুরের চারপাশে ভিড় করে মঞ্চনাটকের মতো এই দৃশ্য দেখে এবং রেহানা রুহুলের খবর শুনবার পর কখন, কীভাবে পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছে এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য অব্যাহত রাখে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মামলার সাক্ষী ময়না পাখি

মনের ভেতর তখন তার ঠিক কী রসায়ন চলছে, আমরা জানি না।

মোহাম্মদ বজলু যখন জানতে পারে, কোনো এক টেলিভিশন চ্যানেলের লোকজন ক্যামেরা নিয়ে তার বাড়ির দিকেই আসছে, তখন সে নিশানদিয়া গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তের তার বাড়ির বিছানায় শুয়ে পড়ে। শোবার আগে তার স্ত্রী মোমেনাকে ডেকে কানে কানে কিছু একটা বলে। খাটের নিচে ঠিক তখন তার বাড়ির মুরগিটা ডিম প্রসব করে ধীর পায়ে খড়ের ঝাঁকা থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে তার সদ্য প্রসবযন্ত্রণা লাঘবের ঘোষণা দেয় 'কক ককক কক'। মোহাম্মদ বজলু কি এই দিনটার জন্যই অপেক্ষা করছিল এত দিন? সে কি মনে মনে চাইছিল যে তারা আসুক এবং তাকে এই নাটকের মঞ্চ থেকে নামিয়ে দিক?

নারকেল পাড়া, ডাব পাড়া, নারকেলগাছের চূড়ার মরা পাতা পরিষ্কার করা, খেজুরগাছে রসের হাঁড়ি বসানো—এ-ই হচ্ছে কাজ বজলুর। নিশানদিয়া গ্রামের গুটিকয় গাছির ভেতর সে একজন। সরু, উল্লম্ব গাছ বেয়ে তরতরিয়ে উঠে যাওয়ার এই নেশা বজলুর আশৈশব। গাছের যে প্রান্তে কেউ যেতে পারে না, বজলুর সেখানে পৌঁছে যাবার নেশা চাপে। ডান থেকে বাম পা, বাম পা থেকে ডান পা এঁকেবেঁকে একটু একটু করে বালক বজলু উঠে যায় কৃষ্ণচূড়াগাছটার একেবারে শেষ চূড়ায়, যেখানে একচ্ছত্র অধিকার নিয়ে বসে ছিল ভুবন চিল। পাতার ফাঁক দিয়ে বজলুর মাথা দেখা দিতেই ত্রস্ত চিল ডেকে ডেকে উড়ে যায় আকাশে। বজলু সেই উঁচু ডালে বসে নিশানদিয়া গ্রামের দূর দূর প্রান্ত দেখতে পায়। দেখতে পায় দূরে কাশেমদের বাড়ির রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া, দেখতে পায় গ্রামের সবচেয়ে রূপসী মেয়ে পারুলের বেড়ায় শুকাতে দেওয়া হলুদ শাড়ি। এই উঁচু থেকে পৃথিবীকে দেখার নেশায় পেয়ে বসে তাকে। ছোট গাছ থেকে বড় গাছ। গ্রামের সবচেয়ে উঁচু গাছের মগডালে চড়ার ঘোর লাগে তার। একেকটা উঁচু গাছ তার জন্য একেকটা চ্যালেঞ্জ। নারকেল আর তালগাছ তার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
প্রিয়তম চ্যালেঞ্জ। এই এক পায়ে সব গাছ ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো গাছগুলোতে দিনের পর দিন উঠতে গিয়ে অনন্য দক্ষতা অর্জন করে সে। তখন অবশ্য সে জানে না যে এই গাছে চড়াই হয়ে উঠবে তার জীবিকা। বজলু হবে নিশানদিয়া গ্রামের গাছি। কিন্তু গাছির কাজ নিয়মিত মেলে না বজলুর। স্ত্রী মোমেনা আর দশ বছরের কন্যা শিল্পীকে নিয়ে তার যে সংসার, শুধু ডাব-নারকেল পেড়ে সে সংসার চলে না। কিন্তু বৃক্ষ পরিচর্যা ছাড়া আর কোনো ব্যবসা শেখেনি বজলু।

সেদিন সকালে গ্রামের মেম্বার আলতাফ আলীর নারকেলগাছ পরিষ্কারের কাজ করছিল বজলু। তরতরিয়ে গাছের চূড়ায় উঠে সেখানকার শুকনো পাতা পরিষ্কার করছিল সে। গোটা দশেক নারকেলগাছ আছে আলতাফ আলীর। প্রথম এবং দ্বিতীয় গাছের শুকনা মরা পাতাগুলো বজলু পরিষ্কার করে ফেলে নিপুণভাবে। তৃতীয় গাছটা যখন পরিষ্কার করছে, তখনই বিপত্তি ঘটে। পা ফসকে উঁচু নারকেলগাছ থেকে পড়ে যায় বজলু। ভেঙে যায় তার ডান পা। মাটিতে পড়ে কিছুক্ষণ বিমূঢ় থাকে সে, তারপর ধীরে তার তীব্র ব্যথা শুরু হয়। আলতাফ আলী সোবহানকে তার ভ্যান নিয়ে আসতে বলে খবর দেয় মোমেনাকেও। সোবহানের ভ্যানে বজলুকে নিয়ে মোমেনা যায় গ্রাম থেকে দশ মাইল দূরে উপজেলা হাসপাতালে। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বলেন, বজলুর ডান উরুর হাড় পুরোটা ভেঙে গেছে। তাঁরা তার পায়ে প্লাস্টার বেঁধে দেন এবং জানান তাকে দ্রুত ঢাকার হাসপাতালে নেওয়া প্রয়োজন। তাঁরা ঢাকার হাড়ভাঙা সারানোর এক বড় হাসপাতালের ঠিকানা দেন। আলতাফ আলী কিছু টাকা ধার দেন বজলুকে। মোমেনা তার কানপাশা বিক্রি করে কিছু টাকা জোগাড় করে। মেয়ে শিল্পীকে মায়ের কাছে রেখে মোমেনা বজলুকে সঙ্গে করে উঠে পড়ে ঢাকার বাসে।

ঢাকার নির্ধারিত হাসপাতালে পৌঁছাতে রাত হয় বজলু আর মোমেনার। মোমেনার ঘাড়ে হাত রেখে কোনোরকম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বজলু হাসপাতালের মূল দরজা দিয়ে ঢোকে। ভেতরে ঢুকে যে পরিস্থিতিতে গিয়ে পড়ে তার জন্য প্রস্তুত ছিল না তারা। দেখতে পায় ভেতরে এক ব্যাপক হই-হুলুস্থুল অবস্থা। হাসপাতালের বারান্দায়, করিডরে অগণিত হাত-পা ভাঙা রক্তাক্ত রোগী, তাদের কারও হাত-পা প্লাস্টার করা, কেউ কেউ তখনো প্লাস্টারবিহীন ভাঙা হাত-পা নিয়ে গোঙাচ্ছে। সেই সব রোগীকে ঘিরে আরও অগণিত মানুষ। সেই সঙ্গে আরও কিছু মানুষ ক্যামেরা আর মাইক্রোফোন নিয়ে হাসপাতালের এদিক-ওদিক দৌড়ে বেড়াচ্ছে। রোগীদের নিয়ে ছোটাছুটি করছে ডাক্তার, নার্স। ঢাকার হাসপাতালে ব্যাপক ভিড় থাকবে, সে ভাবনা তাদের ছিল কিন্তু চারিদিকের এমন নাটকীয়,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উদ্বিগ্ন পরিস্থিতি দেখে তারা ভড়কে যায়। মোমেনা আর বজলু হাসপাতালের বারান্দার এক কোনায় বসে পড়ে। বজলু প্লাস্টার করা পা ছড়িয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে ব্যাপার বোঝার চেষ্টা করে। মোমেনা সাথে করে আনা কলা আর বনরুটি খেতে দেয় বজলুকে। নিজে খায়। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কাগজটা হাতের মুঠোয় রাখে। সেখান থেকে দেওয়া একটা ট্যাবলেট পানি দিয়ে খাওয়ায় বজলুকে। হাসপাতালের রোগীদের অপেক্ষার জায়গায় দেয়ালে লাগানো একটা টেলিভিশনের দিকে চোখ যায় বজলুর। বজলু তার ময়লা হয়ে যাওয়া পায়ের প্লাস্টারে হাত রেখে একবার মানুষের ভিড় ছোটাছুটি দেখে, একবার টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখে।

কিছুক্ষণের ভেতর ব্যাপার খোলাসা হয় বজলুর কাছে। জানতে পারে, সেদিন সকালে ঢাকার এক বড় পোশাক কারখানার দালান ধসে শত শত মানুষ মারা গেছে, আহত হয়েছে হাজার হাজার। সেই আহত লোকেরাই ঢাকার নানা হাসপাতালে ছুটে আসছে। বজলু টেলিভিশনের পর্দায় সেই পোশাক কারখানার ভেঙে পড়া ছাদ, তার ভেতরে আটকে পড়া শ্রমিকদের আহত, নিহত শরীর বের করে আনার প্রক্রিয়া, শ্রমিকদের আত্মীয়স্বজনের আহাজারি, সেনাবাহিনীর তৎপরতা ইত্যাদি দেখে। টেলিভিশনে প্রচারিত ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার পেয়ে আসা শ্রমিকদের জবানবন্দি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে বজলু। টেলিভিশনে সে তেমন লোকের বক্তব্য শোনে, যারা সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে শ্রমিকদের উদ্ধার করতে গিয়ে আহত হয়েছে। এই আহাজারি, ধ্বংসযজ্ঞ, মৃতদেহ টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে দেখতে কেমন ঘোর লাগে বজলুর। নিজের পায়ের ব্যথার কথা ভুলে যায় সে। অনেক রাত অবধি সেই হাসপাতালে আহত রক্তাক্ত রোগীরা আসে। বজলু দেখতে পায় সেসব রোগীর অনেকে কারখানার শ্রমিক, যাঁদের ওপর আছড়ে পড়েছে ইট, পাথর, বিম আবার কেউ কেউ আছেন যাঁরা সেই শ্রমিকদের উদ্ধার করতে গিয়ে হয়েছেন আহত সাংবাদিকেরা ক্যামেরা, মাইক্রোফোন নিয়ে তাঁদের নানা প্রশ্ন করছেন, তাঁরা তার উত্তর দিচ্ছেন। আহত, নিহতদের জন্য ঘোষিত হচ্ছে নানা আর্থিক সাহায্য। বারান্দার দেয়ালে হেলান দিয়ে এসব শোনে বজলু। শুনতে শুনতে কখন যেন তার তন্দ্রা আসে।

ব্যাপারটা কি তার এই তন্দ্রার ভেতরই ঘটে? এই তন্দ্রার ভেতরেই কি তার ওপর ভর করে কল্পনাপ্রসূত গভীর সৃজনশীলতা? কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠবার নানা সূত্র তো বজলুর জীবনে রয়েছে। গাছের মগডালে, আকাশের খুব কাছাকাছি একা একা বৃক্ষ পরিচর্যা করতে করতে একজনের ভেতর গভীর কল্পনা প্রবণতা তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তবে আমরা ধারণা করি, বজলুর কাল্পনিক জগতের সূত্র সম্ভবত অন্যত্র। সে সূত্রটাই বরং বেশি শক্তিশালী। আমরা জানি, এই বৃক্ষ নেশা ছাড়া আরেক গোপন নেশা আছে বজলুর। সেই নেশার সূত্র ধরেই তার মনে চলে কল্পনার চাষ। বজলুর আছে পুঁথি পড়ার নেশা। হাটে গিয়ে নিয়মিত পুঁথির বই কিনে আনে সে। স্কুলের নিচু ক্লাস পর্যন্ত পড়ে যেটুকু বিদ্যার্জন হয়েছে বজলুর, তার একমাত্র ব্যবহার এই পুঁথি পড়ায়। পুঁথি পড়া বলতে জনসমক্ষে পুঁথিপাঠ নয়। পুঁথিপাঠ আর তার গ্রামে এখন হয় না। তবে হাটের দিন দূরের বুড়িরভিটা গ্রামের কবি আবদুল করিম প্রায়ই তাঁর লেখা আধা ফর্মার পুঁথির চটি বই বিক্রি করেন। বজলু আবদুল করিমের অবধারিত ক্রেতা। কবি আবদুল করিমের সঙ্গে একটা সখ্যও গড়ে ওঠে তার। সপ্তাহের জমানো পয়সা দিয়ে সেই পুঁথি কেনে বজলু এবং বাড়িতে এনে হারিকেনের আলোতে পড়ে, মোমেনাকে পড়ে শোনায়। গ্রামে পল্লী বিদ্যুৎ থাকলেও বজলুর তা ভোগ করবার সাধ্য নাই। রাতের খাবার খেয়ে ঘুমাবার আগে হারিকেনের আলোয় একটু একটু করে তারিয়ে তারিয়ে আবদুল করিমের পুঁথি পড়ে শোনায় মোমেনাকে। সুন্দর কণ্ঠ বজলুর আর জানে পুঁথি পড়ার কৌশল।

কিন্তু মোমেনা বজলুকে বাস্তব পৃথিবীতে টানবার চেষ্টা করে, 'পুঁথি পইড়া কেরোসিন শেষ করলে হইব? কেরোসিন কেনার পয়সা কই? গাছির কাম ফালাইয়া অন্য কাম করলেও তো পারো, দুইটা পয়সা বেশি কামাইতে পারবা। মাইনষে কি আর কোনো কাম করে না? সোবহানে ভ্যান চালাইতে শুরু করছে। ভ্যান তো চালাইতে পারো?'

বজলুর ওই সব টায়ার, স্পোক, হ্যান্ডেল ইত্যাদি ধাতব জিনিস নাড়াচাড়া করতে ভালো লাগে না। সে ওই গাছ, পাতা, বাকল এই পৃথিবীতেই থাকতে চায়। আর থাকতে চায় পুঁথির গল্পের পৃথিবীতে। বজলু মোমেনাকে বলে, 'চিন্তা কইরো না। পয়সার ব্যবস্থা একটা হইব। আগে করিমের নতুন পুঁথিটা শুন।'

আলতাফ আলীর নারকেলগাছ থেকে পড়ে যাবার ঠিক আগের রাতেই বজলু একটা আশ্চর্য সমাপতনের ঘটনার পুঁথি পড়েছে। তার স্ত্রী মোমেনাকে পড়ে শুনিয়েছে। সেই পুঁথি পড়বার পর থেকে ঘটনার সমাপতনের ব্যাপারটা বজলুকে বিহ্বল করে রেখেছে। কবি আবদুল করিম বিচিত্র বিষয়ে পুঁথি লেখেন। ইউসুফ জুলেখা বা সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল-জাতীয় বিষয়ে তিনি লেখেন না। লেখেন অদ্ভুত সব বিষয়ে। সে রাতে বজলু যে পুঁথিটা পড়েছিল তার নাম 'মামলার সাক্ষী ময়না পাখি'। নিউজপ্রিন্টে ছাপানো পুঁথির প্রচ্ছদে একটা ময়না পাখির ছবি। বজলু হারিকেনের হলুদ আলোয় সেই পুঁথি পড়ে শুনিয়েছে মোমেনাকে :

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শোনেন বন্ধুগণ দিয়া মন আশ্চর্য ঘটনা। মামলার সাক্ষী ময়না পাখি কবিতার বর্ণনা। আছে এক মেম্বার, নামটি তার জেকের আলী মিয়া। ছোট ভাই তার কাশেম আলী আই এ পাস করিয়া, বেড়ায় ঘুরে ঘুরে। বেড়ায় ঘুরে ঘুরে খাঁচায় পুরে ময়না পাখি পোষে। জীবনের চেয়ে অধিক ভালো পাখিটারে বাসে। শিখায় বাংলা ভাষা। শিখায় বাংলা ভাষা, ইংলিশ ভাষা আরও হিন্দি ভাষা। মিষ্টি মিষ্টি কথা পাখি বলছে কেমন খাসা। একদিন জেকের মিয়া। একদিন জেকের মিয়া রাগ করিয়া কাশেমকে বলিলে, পাখি পুষলে চলবে না ভাই রুজি না করিলে। নাহি জমিদারি। নাহি জমিদারি চিন্তায় মরি সংসার চলবে কিসে। লক্ষ্মীছাড়ার মতো ঘুরলে চলবে না আর শেষে। ভাইয়ের রাগ দেখিয়া। ভাইয়ের রাগ দেখিয়া কাশেম মিয়ার রাগ হইল মনেতে। বাড়ি হইতে যায় চলিয়া পাখি নিয়া সাথে। গেল ফরিদপুরে। গেল ফরিদপুরে, বেড়ায় ঘুরে চাকরি নাহি মেলে। তিন দিন ধরে অনাহারে বসে গাছের তলে। তখন ক্ষুধার জ্বালায়। তখন ক্ষুধার জ্বালায় পাখিটি হায় ঢলে ঢলে পড়ে। কাশেম মিয়া উঠায় হাত আল্লাহরও দরবারে। বলে মালেক সাই। বলে মালেক সাই কেহ নাই তুমি বিনে আর। বিপদ ভঞ্জন প্রভু তুমি, করো কৃপা দান। করো কৃপা দান, বাঁচাও জান ক্ষুধায় যাচ্ছি মরে। তখন স্কুল হইতে একটি মেয়ে এল ধীরে ধীরে। বয়স পনেরো ষোলো, বয়স পনেরো ষোলো, যেন হলো পূর্ণিমারও চান...

স্কুল থেকে আসা পনেরো ষোলো বছর বয়সী পূর্ণিমার চাঁদের মতো এই মেয়েটির নাম মতিজান। পুঁথির গল্পে এরপর দেখা যায় এই রূপসী মেয়ের সামনে কাশেম আলী কুণ্ঠিত, দ্বিধান্বিত, নতশির লজ্জিত কাশেম কোনো কথা বলতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে দেখা যায় কথা বলে উঠেছে সেই ময়না পাখি। ময়না পাখি আকুল কণ্ঠে মতিজানকে জানায়, তার মালিক কাশেম মিয়া তিন দিন অনাহারে আছে। না খেয়ে আছে সে-ও খেতে না পেলে তারা মারা যাবে। এই কথা শুনে মতিজানের মনে দয়া জাগে। মতিজান কাশেম আলী এবং তার ময়না পাখিকে নিয়ে যায় তার বাড়িতে। কাশেম আলীকে বসায় বাড়ির বৈঠকখানায়।

তখন বৈঠকখানায় দেখিতে পায় মতিজানের মায়। ঘরখানা হয়েছে আলো ছেলের চেহারায়। ভাবে মনে মনে। ভাবে মনে মনে ইহার সনে মেয়ের বিয়া দিব। বিয়া দিয়ে জামাই মেয়ে বাড়িতে রাখিব। তখন কাশেমেরে, তখন কাশেমেরে ধীরে ধীরে করে জিজ্ঞাসন। বিদেশেতে তুমি বাবা এলে কী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কারণ। কথা বলে যখন, কথা বলে যখন এল তখন মতিজানের পিতা। নামটি তাহার ওসমান গনি শোনেন সকল শ্রোতা। তিনি অতি ধনী, তিনি অতি ধনী মানে মানী করেন যে কারবার। বড় মহাজন নামটি আছিল তাহার। গিন্নি বলিতেছে, গিন্নি বলিতেছে স্বামীর কাছে, শুনেন প্রাণনাথ। তিন দিন হইল এই ছেলেটির পেটে নাইকো ভাত। করছে আইএ পাস। করছে আইএ পাস ছেড়ে দ্যাশ চাকরি পাওয়ার আশে। পোষা ময়না সঙ্গে নিয়ে ঘুরে দ্যাশে দ্যাশে। বলে ওসমান গনি। বলে ওসমান গনি ওগো গিন্নি, ভাগ্য মোদের ভালো। মতিজানের জোড়া বুঝি খোদায় এনে দিল। তখন বলে বাবা। তখন বলে বাবা কোথায় যাবা চাকরি খুঁজিবারে। আছে কত কর্মচারী আমারি আন্ডারে। তাদের খাটাইবা। তাদের খাটাইবা হিসাব নিবা যখন যেমন চাও, আমার বাড়ি ছেড়ে তুমি পাও না বাড়াও...

ঘরজামাই হয়ে ওসমান গনির ব্যবসাপাতি দেখার দায়িত্বের বিনিময়ে মতিজানের সাথে বিয়ে হয় কাশেম আলীর। কিন্তু এর সাথে মামলা আর ময়না পাখিরই-বা কী সম্পর্ক—বুঝে উঠতে পারে না বজলু। বজলুর সাথে সাথে কৌতূহল চাঙা হয় মোমেনারও। তবু মোমেনা স্মরণ করিয়ে দেয় বজলুকে, 'হারিকেনের ত্যাল কিন্তুক শেষ হইয়া আসতাছে।'

বজলু বলে, 'এই তো আর বেশি বাকি নাই। ঘটনা তো শুরু হইব এখনই।'

ঘটনা এই যে কাশেম মতিজানকে নিয়ে তার শ্বশুর ওসমান গনির ব্যবসা-বাণিজ্য দেখতে থাকে। দিনের পর দিন যায়। অনেক দিন পর কাশেম আলী স্বপ্ন দেখে তার বড় ভাই জেকের আলী তার কোনো খোঁজ না পেয়ে আকুল হয়ে কাঁদছে। তখন কাশেম আলী ওসমান গনির অনুমতি নিয়ে মতিজান এবং সেই পোষা ময়নাকে নিয়ে রওনা দেয় তার নিজের বাড়িতে বড় ভাই জেকের আলীর সাথে দেখা করতে। বাড়ির কাছে পৌঁছাতে রাত হয় তাদের। রাতে নদী পার হবার জন্য নৌকা নেয় তারা। মাঝনদীতে নৌকার দুই মাঝি কাশেমের কাছ থেকে টাকাপয়সা সব কেড়ে নিয়ে তাকে নদীতে ফেলে দেয়। এরপর মতিজানকে তারা তাদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে ভোগ করবে এই ফন্দি আঁটে। মতিজান আকুল কান্নায় তাদের কাছ থেকে মুক্তি চায়। এ সময়ই নদীতে ওঠে ঝড়। নৌকার হাল ভেঙে যায়। মাঝিরা আর নৌকার দিক ঠিক রাখতে পারে না। নৌকা শেষ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে কাশেমের বড় ভাই জেকের আলীর ঘাটেই। জেকের আলী তাহাজ্জতের নামাজ পড়ে গভীর রাতে ঘাটে এলে দুই মাঝি আর মতিজানকে দেখতে পায়। মতিজান তখন প্রায় জ্ঞানহারা। নৌকার ভেতর থাকা কথা বলা ময়না পাখি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাশেমের বড় ভাই জেকের আলীকে তখন চিনতে পেরে ডাক দেয় এবং ঘটনার বিবরণ দেয়। ময়না পাখির কাছে সব ঘটনা শুনে জেকের আলী তখন চৌকিদারকে ডেকে এনে দুই মাঝিকে আটক করে। মতিজানকে নিয়ে আসে বাড়িতে। ঘটনার পাকচক্রে দেখা যায় নদীতে ফেলে দেওয়া কাশেম আলীও ঝড়ের ভেতর সাঁতার কেটে চলে এসেছে জেকের আলীর ঘাটে। কাশেম আলী, জেকের আলী আর মতিজানের মিলন হয়। তারপর দুই মাঝিকে সোপর্দ করা হয় আদালতে। কিন্তু মাঝিরা তাদের সব দোষ অস্বীকার করে। এই সময় গল্পের ক্লাইমেক্স দেখা দেয়। ময়না পাখি তখন বলে সে হবে এই মামলার সাক্ষী।

মামলা জজকোর্টেতে, মামলা জজকোর্টেতে লোক জোটে হাজারে হাজার।
ময়না পাখি দিবে সাক্ষী শুনেন চমৎকার।
পাখি সাক্ষী দেয়, পাখি সাক্ষী দেয় বলে যায় ইংরাজিতে বাণী।
হাকিম বাবু হলো তাজ্জব পাখির বুলি শুনি।
তারপর বাংলায় পড়ে, তারপর বাংলায় পড়ে জিজ্ঞাস করে যতেক বিষয়।
বাংলাতে ইংরাজিতে মিলে পাখি সবই বলে যায়।

কবিতা ইতি হইল, কবিতা ইতি হইল রায় লিখিল, জজ সাহেব তখন।
দুই মাঝির কারাদণ্ড হলো যাবৎ জীবন।
ধন্য পাখির ভাষা, ধন্য পাখির ভাষা শুনতে খাসা খুশি সর্বজনে—
পাখিকে করিল দান যাহার যা আছে প্রাণে
দেখলাম একুনেতে, দেখলাম একুনেতে হইবে তাতে টাকা নয় হাজার
ধন্য ধন্য ময়না পাখি শুনেন সমাচার...

ময়না পাখির আশ্চর্য এই কেরামতিতে মেম্বেন বিস্মিত হয় সে রাতে। ক্ষণিকের জন্য ভুলে যায় কেরোসিনের অভাব বাতি নিভিয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকে তারা।

এই পুঁথি পড়বার পরদিনই বজলু গাছ থেকে পড়ে তার পা ভাঙে উপজেলা হাসপাতাল ঘুরে আসে ঢাকার হাসপাতলে। তারপর হাসপাতালের এক বিচিত্র নাটকীয় পরিস্থিতির ভেতর ঢুকে গিয়ে একসময় হাসপাতালের করিডরেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এই তন্দ্রার মধ্যেই কি তার ফুরিয়ে যাওয়া কেরোসিন তেল, কৃষ্ণচূড়াগাছের মগডালে দেখা পাওয়া ভুবন চিল, মতিজানের নৌকা, নদীতে ঝড়, জেকের আলীর ঘাট, ইংরাজি বলতে পারা ময়না পাখি ইত্যাদি সব তালগোল পাকিয়ে যায়?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঠিক সেই সময়েই কি বজলুর মনের খুব গভীর থেকে মাথা তোলে আদিম সরল কোনো মানব অথবা অতি দক্ষ এক প্রতারক? এমন দুজনই কি বস্তুত বজলুর অজান্তে ঘুমিয়ে ছিল তার ভেতর? কিম্বা তারা ঘুমিয়ে থাকে আমাদের সবার ভেতরেই?

কে একজন তাকে ধাক্কা দিলে বজলুর তন্দ্রা ভাঙে। চোখ খুলে বজলু দেখতে পায় তার দিকে তাক করা বন্দুকের মতো একটা ক্যামেরা আর মাইক্রোফোন। মাইক্রোফোন ধরা লোক তাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি প্লাজা ফ্যাক্টরির রোগী?

বজলু বলে, হ্যাঁ।

মাইক্রোফোনের লোক, আপনি কি ফ্যাক্টরির শ্রমিক?

বজলু, না।

মাইক্রোফোনের লোক, তাইলে?

বজলু বলে, আমি ফ্যাক্টরির এক মাইয়ারে বাঁচাইছি।

মাইক্রোফোনের লোক, কী হইছিল বলেন তো।

ইতিমধ্যে আরও অনেকগুলো ক্যামেরা, মাইক্রোফোন বজলুর মুখের ওপর এসে দাঁড়ায়।

কেউ একজন সম্ভবত কোনো একদিন বলেছেন, কবিতা হচ্ছে সেই মিথ্যা যা সত্যকে বুঝতে সহায়তা করে। বজলু এই সময় তেমন এক কবিতা রচনায় ব্রতী হয়।

বজলু বলে, সে আসলে এই শহরের এক রিকশাচালক। এক যাত্রীকে নামিয়ে সে ওই প্লাজার পাশের এক রাস্তায় তখন বিশ্রাম করছিল। হঠাৎ সে একটা বিকটা শব্দ শুনতে পায়। ভাবে কোথাও বোমা ফাটল বুঝি। তারপরেই দেখে রাস্তার পাশের সেই বহুতল ফ্যাক্টরিটা ধসে পড়ছে। চারিদিকে ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে পড়ে। বহু মানুষের সঙ্গে সে-ও ছুটে যায় সেখানে। সেখানে দাঁড়িয়ে সে ঘটনা দেখতে থাকে। কিছুক্ষণ পর সে দেখতে পায় ফ্যাক্টরির দক্ষিণ কোনায় কিছু মানুষ কারখানার শ্রমিকদের উদ্ধার করার চেষ্টা করছে। বজলু চলে যায় সেখানে। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় উদ্ধারকাজে। সেখানে তারা কংক্রিটের স্তূপের ভেতর একজন নারী শ্রমিকের কান্না শুনতে পায়। বজলু তখন রড, বিম, ইটের ফাঁকফোকর দিয়ে নেমে পড়ে সেই ধ্বংসস্তূপের ভেতর যেখানে আটকে আছে মেয়েটা। দেখতে পায় মেয়েটার একটা হাত বিশাল এক বিমের নিচে আটকা পড়ে আছে। মেয়েটাকে বাঁচাতে হলে তার হাতটা কাটতে হবে। বজলু ওপরে উঠে এলে উদ্ধারকাজে নিয়োজিত এক ডাক্তার তাকে বলেন সে মেয়েটার হাত কাটতে পারবে কি না। বজলু রাজি হয়। ডাক্তার তাকে একটা রড কাটার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করাত আর সিরিঞ্জে ব্যথানাশের ওষুধ দিয়ে আবার ধ্বংসস্তূপের ভেতর পাঠান। বজলু রড বিম, ইটের ফাঁক দিয়ে আবার ঢুকে যায় ধ্বংসস্তূপের নিচে। সেখানে গিয়ে সে মেয়েটাকে ইনজেকশন দেয় এবং তারপর করাত দিয়ে মেয়েটার হাত কাটে। এরপর সে মেয়েটাকে টেনে ধ্বংসস্তূপ থেকে তুলে পাঠিয়ে দেয় ওপরে উদ্ধারকারীদের হাতে। কিন্তু তারপর নিজে যখন সে সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে আসতে গেছে, তখনই একটা বড় কংক্রিটের বিম তার পায়ের ওপর পড়ে এবং তার পায়ের হাড় ভেঙে যায়। এরপর কারা কখন তাকে এই হাসপাতালে নিয়ে এসেছে, সে আর বলতে পারে না।

একটানা এই কবি কাহিনি বলে যায় বজলু। তার কাছে এই কাহিনি শুনবার পর সাংবাদিক, ডাক্তার সবাই তৎপর হয়ে ওঠে বজলুকে নিয়ে। তাকে করিডর থেকে ওয়ার্ডের ভেতর একটা বেডে নেওয়া হয়। মোমেনা বিস্ময়ে বজলুকে লক্ষ করে। কানে কানে বলে, তুমি কী কও এই সব?

কিছু বলে না বজলু। তবে কি বজলু নিরীহ গাছি নয়? গাছের চূড়া থেকে পৃথিবীকে দেখতে দেখতে সে হয়ে উঠেছে গভীর চিন্তক? সে জেনে গেছে মানুষ অবিরাম সুতার ওপর দিয়ে হাঁটে—যার একদিকে থাকে সত্য, অন্যদিকে মিথ্যা। সে জেনে গেছে, পরিস্থিতি মোতাবেক সত্য নির্মাণ করা প্রতিভাবানদেরই কাজ।

পরদিন পত্রিকায় প্লাজা ফ্যাক্টরির বীর নামে সংবাদ ছাপা হয় বিভিন্ন পত্রিকার পাতায়। নিজের জীবন বিপন্ন করে যাঁরা বহু শ্রমিকের জীবন রক্ষা করেছেন, তাঁদের কাহিনি ছাপা হয়। সেখানে বজলুর নাম ও ছবি ছাপা হয়। পোশাক মালিক সমিতি, সরকার, বাংলাদেশের পোশাকের অন্যতম ক্রেতা প্রাইমার্ক কোম্পানি বজলুসহ এই বীরদের লাখ লাখ টাকা পুরস্কার দেবার ঘোষণা দেয়। সব মিলিয়ে বজলুর কাছে বিশ লাখ টাকার চেক আসে। উদ্ধারকাজ পরিচালনাকারী সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে বজলু এবং মোমেনার নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে সেই টাকা জমা রাখা হয়।

মোমেনা বাকহীন দর্শকের মতো ব্যাপার দেখতে থাকে। মোমেনা আর বজলু নিজেদের ভেতর এ নিয়ে আর কোনো কথা বলে না।

ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে বজলু। হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে। তারপর একদিন বজলু ফিরে যায় নিশানদিয়া গ্রামে। যাবার আগে কর্তৃপক্ষ তাকে তার ব্যাংক হিসাব বুঝিয়ে দেয়।

নিশানদিয়া গ্রামের লোকেরা দেখতে পায় বহুদিন পর ফিরে এসে বজলু তার গ্রামের কাঁচা বাড়িটাকে ভেঙে পাকা একতলা দালান করেছে। দেখতে পায় বজলু গাছির কাজ ছেড়ে হাটে একটা কাপড়ের দোকান দিয়েছে। তার বাড়িতে পল্লী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিদ্যুৎ এসেছে। নিশানদিয়া গ্রামের লোকেরা টেলিভিশনে প্লাজা ফ্যাক্টরির দুর্ঘটনার খবর পেয়েছে, তারপর আবার তা ভুলেও গেছে। তারা তাদের পেঁয়াজ চাষ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া প্লাজা ফ্যাক্টরির ঘটনার সাথে বজলুর কোনো যোগসূত্রের কথা তাদের ভাবনায় আসেনি। তারা শুধু অবাক হয়ে দেখেছে নারকেলগাছ থেকে পড়ে পা ভেঙে ঢাকায় যাবার পর বজলুর কপাল খুলেছে। তারা তার এই কপাল খুলে যাবার রহস্যের কথা ভাবে ঠিকই, কিন্তু সেই রহস্যের কূল খুঁজবার জন্য তেমন ব্যাকুল হয় না। মোমেনা নিজের জন্য নতুন কানপাশা কেনে, মেয়ে শিল্পীর জন্য কেনে দামি জামা, গলার সোনার হার।

মোমেনা ও বজলু পরস্পরের ভেতর প্লাজা ফ্যাক্টরির ঘটনা বিষয়ে এক আশ্চর্য নীরবতা পালন করে।

তবে প্লাজা ফ্যাক্টরির দালান ধসের গভীরে নীরবে প্রচ্ছন্ন থাকা পুঁজির দৌরাত্ম্য, মুনাফার প্রকট লোভ, ক্ষমতার কারসাজির পাশে মোমেনা আর বজলুর এই কপট নীরবতা তুল্যমূল্য কি না, তা ভেবে দেখা যেতে পারে।

একদিন বজলু হাটে গিয়ে দেখা করে কবি আবদুল করিমের সাথে। বলে, 'করিম ভাই, তুমি একটা নতুন পুঁথি লেখো প্লাজা ফ্যাক্টরির গল্প নিয়া, আমি তোমারে প্লাজা ফ্যাক্টরির এক গল্প শোনাই।'

অভিনব বিষয়ে পুঁথি লেখায় বরাবরের আগ্রহ আবদুল করিমের। বজলুর গল্প শুনে কবি আবদুল করিম নতুন পুঁথি লেখে :

> শোনেন বন্ধুগণ দিয়া মন আশ্চর্য ঘটনা, রিকশাওয়ালা মাতওয়ালা করে অপারেশন প্লাজা ফ্যাক্টরিতে। প্লাজা ফ্যাক্টরিতে দিনে রাতে মেশিন চলে ভারী। সেই মেশিনে পোশাক বানায় কত নর-নারী। পোশাক চলে যায়, পোশাক চলে যায় আমেরিকায় আরও কত দেশে, পুরুষ-নারী কাজে যায় সবাই হেসে হেসে। একদিন দেখতে পায়, একদিন দেখতে পায় হায় হায় দেয়াল গেছে ফেটে। তবু মালিক বলে যেতে হবে কাজে হেঁটে হেঁটে কোনো মাফ নাই। কোনো মাফ নাই কাজ চাই এতেক বলিয়া, প্লাজার মালিক রানা মিয়া বাড়ি যায় চলিয়া। তারপর কী ঘটিল...

পরের হাটে পাওয়া যায় আবদুল করিমের প্লাজা ফ্যাক্টরি পুঁথি। বজলু সেই পুঁথি কিনে আনে। কিন্তু মোমেনাকে সে তা পড়ে শোনায় না। তারা এ বিষয়ে নীরবতা পালন করবে মোমেনা আর বজলুর ভেতর যেন এক অলিখিত চুক্তি হয়ে আছে।

দিন যায়। আমরা ঠিক জানি না প্লাজা ফ্যাক্টরির ঘটনা বজলু তার মনের ভেতর কীভাবে মোকাবিলা করছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তারপর বছর তিন পর হঠাৎ নিশানদিয়া গ্রামে একদিন ক্যামেরা, মাইক্রোফোন নিয়ে হাজির হয় এক টিভি চ্যানেলের গাড়ি। টিভির সাংবাদিক হাটের লোকেদের বলে তারা এই গ্রামে প্লাজা ফ্যাক্টরির ঘটনার এক ভুয়া বীরকে খুঁজতে এসেছে। গ্রামে টেলিভিশনের লোকের আসার এই খবর শুনে বজলু নিশানদিয়া গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তের তার বাড়ির বিছানায় শুয়ে পড়ে। শোবার আগে স্ত্রী মোমেনাকে ডেকে কানে কানে কিছু একটা বলে। খাটের নিচে ঠিক তখন তার বাড়ির মুরগিটা ডিম প্রসব করে ধীর পায়ে খড়ের ঝাঁকা থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে তার সদ্য প্রসবযন্ত্রণা লাঘবের ঘোষণা দেয় 'কক ককক কক'। বজলু কি এই দিনটার জন্যই অপেক্ষা করছিল এত দিন?

টিভি চ্যানেলের গাড়ি বজলুর বাড়িতে এসে থামে। সাংবাদিক ক্যামেরা বজলুর দিকে তাক করে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার নাম কি মোহাম্মদ বজলু?

বজলু শুয়ে থাকে, কোনো কথা বলে না।

সাংবাদিক : আপনে উত্তর দেন না কেন?

বজলু তখনো নিশ্চুপ থাকে।

সাংবাদিক : প্লাজা ফ্যাক্টরির দুর্ঘটনায় কী ঘটছিল সে ব্যাপারে আমাদের জানার আছে। আপনি তখন আমাদের বলছিলেন যে আপনে রিকশা চালান, আপনে কোন গ্যারেজের রিকশা চালাতেন?

বজলু সাংবাদিকের দিকে তাকিয়ে থাকে কিন্তু কোনো কথা বলে না।

সাংবাদিক তার স্ত্রী মোমেনাকে জিজ্ঞাসা করে, কী ব্যাপার, উনি কথা বলছেন না কেন?

মোমেনা বলে, তার তো এক সপ্তাহ হইল জবান বন্ধ। গন্ডপাশা গ্রামের কবিরাজরে খবর দিছি।

বজলু তার রহস্যময় মৌনতার মাধ্যমে কি বস্তুত প্লাজা ফ্যাক্টরির ঘটনাপরম্পরাকে কালের গর্ভে ছুড়ে দেওয়ার পাঁয়তারা করছে?

নাকি সে আসলে এই সাংবাদিককে কৃতজ্ঞতা জানাবার জুতসই ভাষা খুঁজে না পেয়ে নির্বাক হয়ে আছে। কথা সত্য যে এই সাংবাদিক বজলুকে এই অভিনয় মঞ্চ থেকে অব্যাহতি দেবার একটা সুযোগ এনে দিয়েছে।

আমাদের পক্ষে জানা দুষ্কর—বজলুর মনের ভেতর তখন আসলে কী রসায়ন চলছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নাজুক মানুষের সংলাপ

উত্তরসূরি : কথা তাহলে তাই?

পূর্বসূরি হ্যাঁ, কথা তাই। সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যেয়ো না। উত্তরের চাইতে প্রশ্নগুলোকে ভালোবাসতে শেখো। এ মুহূর্তে উত্তর তুমি পাবে না। উত্তর তোমাকে দেওয়া হবে না। কারণ, সব প্রশ্নের উত্তরের ভার তুমি এই মুহূর্তে বইতে পারবে না। বরং প্রশ্নগুলোকে মনের সিন্দুকে তালাবদ্ধ করে রাখো। আপাতত সেই সব প্রশ্নগুলোকেই ভালোবাসো। কোনো এক দূর ভবিষ্যতে তোমার অজান্তেই উত্তরগুলো তোমার কাছে এসে হাজির হবে।

উত্তরসূরি : কিন্তু এই প্রবল দ্বিধা নিয়ে এভাবে দিন কাটানো আমার পক্ষে তো কঠিন হয়ে উঠছে।

পূর্বসূরি : বুঝতে পারি। তুমি বনের প্রান্তে এসে হাজির হয়েছ। অনেকগুলো পথ বনের ভেতর অদৃশ্য হয় গেছে। পথের মুখ দেখতে পাচ্ছ কিন্তু প্রান্ত দেখতে পাচ্ছ না। কোন পথ ধরবে এই নিয়ে দ্বিধান্বিত আছ, তাই তো?

উত্তরসূরি : ঠিক তাই। আপনি তো প্রাজ্ঞ পথিক। উত্তর নাই-বা দিলেন অন্তত বলেন, কোন পথ নিলে উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

পূর্বসূরি পাহাড় দেখেছ?

উত্তরসূরি : হ্যাঁ, দেখেছি।

পূর্বসূরি তাহলে চোখ বন্ধ করে কোনো এক উঁচু পাহাড়ের কথা ভাবো।

উত্তরসূরি : ভাবলাম।

পূর্বসূরি চিরুনি ব্যবহার করো?

উত্তরসূরি : করি।

পূর্বসূরি : এবার চোখ বন্ধ করেই তোমার প্রতিদিনের ব্যবহার্য চিরুনিটার কথা ভাবো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উত্তরসূরি : ভাবলাম।

পূর্বসূরি : এই যে বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্র ভাবনায় যাতায়াত করার পদ্ধতি, একে রপ্ত করো।

উত্তরসূরি : তাতে কী লাভ?

পূর্বসূরি : তাতে পথ বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসাটা তোমার পক্ষে সহজ হবে। কাঁচাবাজারে মুরগির পালক, চামড়া ছেলার কাজ করে কিছু তরুণ, তাদের দেখেছ?

উত্তরসূরি : দেখেছি। কেন?

পূর্বসূরি : ওই যে তরুণ কিংবা তার মতো আরও অনেকের জন্য কিন্তু তোমার মতো বনের ভেতর এমন নানা পথ খোলা নেই। তাদের পথ বেছে নেবার বিলাসও নেই। তারা হয়তো জন্মেই দেখতে পায় পথ তাদের একটাই। তার বিকল্প নেই। যে তরুণ কাঁচাবাজারে মুরগির পালক, চামড়া ছেলার কাজ করে সে ক্রমশ টের পায় মুরগির পালক, চামড়া ছেলাই তার নিয়তি।

উত্তরসূরি : সন্দেহ নেই মুরগি ছেলা তরুণের চাইতে আমার সম্ভাবনার দিগন্ত বিস্তৃত। সে জন্যই তো আমার দ্বিধা। আমি এভাবে দ্বিধা নিয়ে বসে থাকতে পারি না। আমাকে তো এগিয়ে যেতে হবে।

পূর্বসূরি : এগিয়ে যাওয়া মানে শুধু একটা পথ নেওয়াকে বোঝায় না। তুমি কখনো ডানে যাবে, কখনো বাঁয়ে, কখনো ওপরে যাবে, কখনো নিচে। এভাবেই এগিয়ে যেতে হবে তোমাকে।

উত্তরসূরি : কিন্তু এভাবে চারিদিক ঘুরতে থাকলে পথ হারিয়ে ফেলব না?

পূর্বসূরি : পথ হারিয়ে ফেলাতে সমস্যা নেই। বিশেষত তোমার এই বয়সে। তুমি হারিয়ে গেলেই তোমার উপস্থিতি টের পাওয়া যাবে তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মাইকে ঘোষণা হচ্ছে, 'দুলাল, তুমি যেখানেই থাকো প্যান্ডেলে চলে আসো তোমার মা সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।' রঙিন প্যান্ডেল বাতাসে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো উড়ছে তবু দুলাল ফিরছে না। হারিয়ে গেছে বলেই সবার ভেতর দুলালের জন্য এমন হাহাকার তৈরি হয়েছে। হারিয়ে গেলে পাওয়ার ইচ্ছাটা যে হারিয়েছে তার কাছে এবং অন্যদের কাছে খোলাসা হয়।

উত্তরসূরি : কিন্তু এভাবে ডানে, বাঁয়ে, ওপর নিচ করলে ফিরব কোথায়?

পূর্বসূরি : আপাতত যাত্রা করো পরিব্রাজকের মতো, পর্যটকের মতো না। পর্যটক হচ্ছে সেই মানুষ, যার ঘরে ফেরার পরিকল্পনা আছে আর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিব্রাজকের সেই পরিকল্পনা নেই। পরিব্রাজকের কাছে গন্তব্য প্রধান না, পথটাই প্রধান।

উত্তরসূরি : তাহলে বাড়ি বলেও কি কিছু থাকবে না?

পূর্বসূরি : বাড়ির ধারণা বস্তুত একটা মায়া। তবে যতই তা মায়া হোক, যতই বাড়িতে ফেরার পরিকল্পনা না থাকুক, সবারই একটা বাড়ি থাকা দরকার। বাড়ি তো একটা কাঠামোমাত্র না, নানা অনু অনুভব, স্মৃতির উপলক্ষ। তুমিও মায়াবলে আচ্ছন্ন একটা বাড়ি খুঁজে নিয়ো। তবে জেনে রেখো সেটা মায়াই, সত্য না।

উত্তরসূরি : সত্য তাহলে কী?

পূর্বসূরি : যে ব্যাপারগুলো আমরা সবার শেষে আবিষ্কার করি তারই নাম দিই সত্য। সত্যকে একটা নদী ভাবতে পারো, যা ভাগ হয়ে যায় শাখা-প্রশাখায় তারপর আবার একত্র হয়। মাঝখানে তৈরি হয় চর। সেই চরের অধিবাসীরা চিরকাল তর্ক করে কোনটা আসল নদী তা নিয়ে। আর চরে দাঁড়িয়ে সারস দম্পতি সেই তর্ক শোনে।

উত্তরসূরি আমি কি তাহলে ওই চরের সারসের ভূমিকা নেব?

পূর্বসূরি সেটা তুমি এখন পারবে না। এখন সারস দম্পতির মতো দর্শক-শ্রোতার ভূমিকা নেওয়ার যোগ্য তুমি নও। কারণ, এখন তোমার বুকের ভেতর নানা রকম ঢেউ উঠবে।

উত্তরসূরি : কিসের ঢেউ?

পূর্বসূরি : নৈতিকতার, যৌনতার, হয়তো নান্দনিক সৃজনশীলতার।

উত্তরসূরি : কেমন নৈতিকতা?

পূর্বসূরি : ঘোর নৈতিক কোনো আদর্শের, যার জন্য তোমার জীবন বাজি রাখতে ইচ্ছা হবে। কালে কালে এমন বিবিধ আদর্শের জন্য অগণিত তরুণ-তরুণী জীবন দিয়েছে সেসব আদর্শ সফল কি ব্যর্থ, সেটা বিবেচনার ব্যাপার না। আসলে এসব জীবন বিসর্জনের ভেতর মানুষের স্বপ্নের এবং আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস লুকিয়ে থাকে। যারা সমুজ্জ্বল পৃথিবী চায় তাদের সংকল্পকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিয়ে যেতে হয়। এসব আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্নের ভেতর বুদ্ধিমানের জন্য চিন্তার খোরাক আছে।

উত্তরসূরি : আর যৌনতা?

পূর্বসূরি : জানো তো আদিম এককোষী প্রাণী অ্যামিবা অমর? কিন্তু তার কোনো যৌনতা নেই। একে অন্যের সঙ্গে মিলিত না হয়ে কেবল নিজেকে ভেঙে ভেঙে সে বংশবিস্তার করে। তার যেমন যৌনতা নেই তেমনি মৃত্যুও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নেই। কিন্তু প্রজাতি রক্ষার জন্য মানুষকে যৌনতায় লিপ্ত হতে হয়। এই যৌনতার বিনিময়ে তাকে অমরত্ব বিসর্জন দিয়ে আলিঙ্গন করতে হয়েছে মৃত্যুকে। তবে সেই যৌনতার সঙ্গে যদি প্রেম যুক্ত হয়, তাহলে হয়তো খানিকটা অমরত্বের সাধ মিটতে পারে। নৈতিকতার মতো যৌনতাও তোমাকে টানবে।

উত্তরসূরি : আর সৃজনশীলতার?

পূর্বসূরি : মানুষ নান্দনিক জীব। নকশা পিঠার স্বাদের কোনো পরিবর্তন করে না, তবু সে নকশি পিঠা বানায়। নান্দনিক সৃজনশীলতাও তার একটা তাড়না। অবশ্য বাবুই পাখিরও নান্দনিক সৃজনশীলতা আছে। অপূর্ব, জটিল এক বাসা বানায় সে। কিন্তু বাবুই ওই একই নান্দনিকতায় বন্দী, এর চেয়ে ভালো বা মন্দ কিছু সৃষ্টি করার দক্ষতা তার নেই। পক্ষান্তরে মানুষের সৃজনশীলতা নানা রহস্য আর অনিশ্চয়তায় আচ্ছন্ন। ফলে তার সৃজনশীলতার পথ বেদনাচিহ্নিত। কখনো শুনেছ যে গ্রামের বিল থেকে হঠাৎ ভেসে ওঠে তলায় লুকিয়ে থাকা কলসি?

উত্তরসূরি : না, শুনিনি।

পূর্বসূরি : বিলের তলদেশের চুপচাপ অদৃশ্য থাকা কলসিকে হঠাৎ ভেসে উঠতে দেখে মানুষ। তুমিও হয়তো দেখতে পাবে তোমার ভেতর থেকে হঠাৎ ভেসে উঠেছে নৈতিকতা, যৌনতা বা সৃজনশীলতার কলসি।

উত্তরসূরি : সে কলসি কত দিন ভেসে থাকবে?

পূর্বসূরি : যতক্ষণ তোমার মনে স্পৃহা থাকবে ততক্ষণ হয়তো সেই কলসি ভেসে থাকবে। কিন্তু ধীরে ধীরে স্পৃহা ভেজা দেশলাইয়ের কাঠির মতো নেতিয়ে পড়বে।

উত্তরসূরি : কেন?

পূর্বসূরি : কারণ, প্রকৃতির আশ্চর্যতম রহস্য এই যে সে থামতে জানে। ঝড় থামে। গাছ বাড়তে বাড়তে আকাশ ছোঁয় না

উত্তরসূরি : কলসি ডুবে যাওয়ার পর তাহলে কী হবে?

পূর্বসূরি : তারপর হয়তো মহল্লার রকিবুলের মতো জীবন হবে তোমার, যে প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিস দিয়ে বাড়ি ফেরে। সে শিস দেয় কারণ পরদিন তার ছুটি, ভেতরে ভেতরে সে খুব নির্ভার বোধ করে। তার জীবনে প্রমোশন, ইনক্রিমেন্ট, বোনাস, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, খেলনা উড়োজাহাজ, দুই কেজি পেঁয়াজ ইত্যাদি আছে। তারপর আছে রোববার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শেষে ওই একটা শিস।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উত্তরসূরি : রকিবুল কি তাহলে একজন পরাজিত মানুষ?

পূর্বসূরি : সবকিছুই জয়-পরাজয়ের পাল্লায় মাপার কিছু নেই। রকিবুল আসলে দক্ষতার সঙ্গে জীবনের পৌনঃপুনিকতাকে রক্ষা করছে। অনেক নির্বোধও কঠিন বিপদের সময় পার করে দিতে পারে কিন্তু প্রতিদিনের পৌনঃপুনিকতা মোকাবিলা করা প্রতিভার কাজ। তা ছাড়া রকিবুলের জীবনটাকে আপাতভাবে তরমুজের মতো গোলগাল মনে হলেও সেখানেও আছে ভেজা গল্প। যেমন কেউ জানে না এই বর্ষায় নানাজনের নানা ক্ষতি হলেও রকিবুলের গোপন অথচ বড় একটা ক্ষতি হয়েছে। এই বর্ষায় তার জমিয়ে রাখা সব চিঠি ভেসে গেছে।

উত্তরসূরি রকিবুলের কাছে আপনার কি কোনো প্রত্যাশা ছিল না?

পূর্বসূরি সত্যি বলতে মানুষকে আমি যত জেনেছি, তার কাছ থেকে আমি তত কম প্রত্যাশা করতে শিখেছি। যত দিন গেছে মানুষকে আমি তত সহজ শর্তে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছি। চলমান ট্রেনের জানালা থেকে দেখা অপস্রিয়মাণ দৃশ্যের মতো মানুষ বিষয়ে আমার ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। প্রতিটি দিন অভ্যস্ত ধারায় কেটে যাবে ভেবেও দেখেছি, তা কেমন দিন শেষে অন্য রকম হয়ে যায়। ফলে রকিবুল বিষয়ে কোনো স্থির প্রত্যাশা আমার ছিল না।

উত্তরসূরি মানুষের এই যে নানা রূপ তা কি আপনাকে বিচলিত করে?

পূর্বসূরি : না, আমি বরং মানুষের নানা রূপ উপভোগ করি। মানুষ যখন স্বাভাবিক থাকে তখন সে সহজে নিজের কথা বলে না। তাকে একটা মুখোশ দিলে সে অনায়াসে নিজেকে খোলে। আলোতে না খুললেও অন্ধকারে খোলে।

উত্তরসূরি যা অন্ধকারে খোলে তা কি ভালো?

পূর্বসূরি তুমি এখন ভালো-মন্দের নাগরদোলায় চড়ে আছ। সেটা ভালো। তবে একদিন তুমি এই নাগরদোলা থেকে নামবে। তখন জানবে অন্ধকার ভালো বলেই শান্ত পৃথিবীর আলো নিভে আসে। তবে সেই অন্ধকারে চলার জন্য নিজের কাছে একটা গোপন চাবুক রাখা দরকার, যাতে সে তোমাকে পথ দেখিয়ে নিতে পারে। নইলে সাপের শরীরে পড়বে তোমার পা।

উত্তরসূরি কিন্তু আপনি পথ হারাতেও তো বলেছিলেন।

পূর্বসূরি : সেটা একটা কালপর্ব অবধি। তারপর তোমাকে সতর্ক হতে হবে। বর্তমানের ব্যাপারে সতর্ক। খোলা মাঠে ঘুরে বেড়ানো কোনো মোরগকে লক্ষ করলে দেখবে বর্তমান বিষয়ে ওর সতর্কতা কী তীক্ষ্ণ। কিন্তু মানুষের 'বর্তমান' মোরগের বর্তমানের মতো সরল না। মানুষের বর্তমানের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ভেতর অতীত এবং ভবিষ্যৎ গ্রথিত থাকে। বর্তমান আসলে একটা সময়গ্রন্থি। সিন্দুকে জমিয়ে রাখা তোমার সেই প্রশ্নগুলো এই গ্রন্থি খুলতে তোমাকে সাহায্য করবে। ইতিমধ্যে তুমি টের পেয়ে যাবে তোমার শক্তি আর সীমাবদ্ধতা।

উত্তরসূরি : আমি তো শুধু আমার সীমাবদ্ধতাই দেখি, শক্তি দেখতে পাই না।

পূর্বসূরি : মনে রেখো তুমি জগতের মাপমতো নও, জগৎও তোমার মাপমতো না। আর জগৎসংসারে কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ না। সমুদ্রের হারমিট কাঁকড়ার খোঁজ করে দেখো। খোলসহীন শরীর নিয়ে জন্ম নেয় সে তারপর সমুদ্রে মরা কোনো শামুকের খোলস খুঁজে তার ভেতর আশ্রয় নেয় এবং তাতেই কাটিয়ে দেয় জীবন।

উত্তরসূরি : কিন্তু আমি বোধ হয় আমার আশ্রয় খুঁজে পাব না কখনো।

পূর্বসূরি : হারমিট কাঁকড়া একটা কৃত্রিম আশ্রয় খুঁজে পায় ঠিকই কিন্তু তার আশ্রয়হীনতার আশঙ্কা তো যায় না। আশ্রয়হীনতার এই আশঙ্কা তোমাকে তাড়া করবে আজীবন। জীবনে প্রায়ই এমন মুহূর্ত আসবে যখন ভূমিধসের মতো চারপাশ থেকে ধসে পড়বে বিশ্বাস, আস্থা। মন ক্ষতবিক্ষত হবে। ভয়ংকর নিরালম্ব লাগবে। হয়তো তখনই তোমার প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমার কাছে ধরা দেবে উড়ন্ত প্রজাপতির মতো। প্রজাপতিকে ধরতে চাইলেই ধরা দেয় না। অথচ কোথাও যদি স্থির হয়ে বসো, তাহলে প্রজাপতি আলতো করে তোমার মাথায় এসে বসতে পারে। প্রশ্নের উত্তরও সে রকম

উত্তরসূরি : তাহলে তাই হোক। আপনার আশীর্বাদ কামনা করি।

পূর্বসূরি : আশীর্বাদ রইল। তবে প্রস্তুত থেকো, যে হিসাব কষবে তা না মিলবার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ, মানুষ ভীষণ নাজুক কতটা নাজুক মানুষ তা নিজেই জানে না। অন্যে না জানুক, অন্তত তুমি তা জেনে রাখো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও